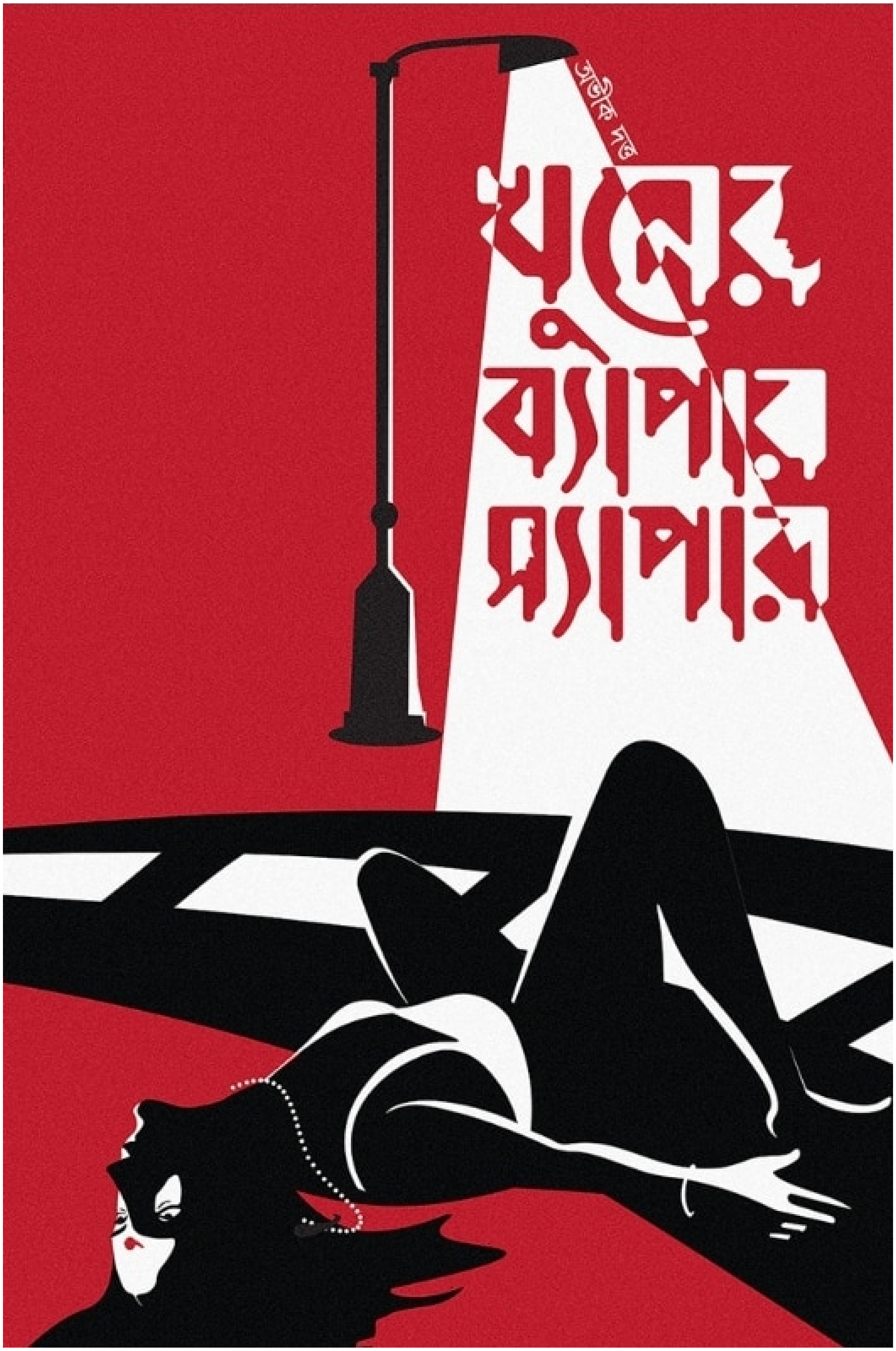

অভীক দত্ত
খুনের
ব্যাপার
স্যাপার


অভীক দত্ত
খুনের
ব্যাপার
স্যাপার

খুনের ব্যাপার স্যাপার

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

Khuner Byapar Syapar By Abhik Dutta

প্রচ্ছদঃ সুবিনয় দাস
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

সূচিপত্র

১ ।। "তারে ধরি ধরি মনে করি" ।।

২ ।। "মেরে মেহবুব কেয়ামত হোগি"।।

৩ ।। "আজ নিশীথে, কাছে থাকো, না বোলো না।।

৪ ।। "রাত আকেলি হ্যায়" ।।

৫ ।। "আই অ্যাম দ্য বেস্ট" ।।

৬ ।।"নীল আকাশের নীচে"।।

৭ ।। "বড় একা লাগে, এই আঁধারে" ।।

৮ ।। "ইয়ে তো হোনা হি থা" ।।

৯ ।। কেন মেঘ আসে।।

১০ ।। "সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা" ।।

১১ ।। "সবাই তো সুখী হতে চায়" ।।

১২ ।। "বসন্ত এসে গেছে" ।।

১৩ ।। "তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল"।।

১৪ ।।"ভাগ ডিকে বোস"।।

১৫ ।। "হৃদয়ে আমার কী যে ব্যথা, তুমি তো সে কথা জানো না" ।।

১৬ ।। "এই একলা ঘর" ।।

১৭ ।। "যখন সময় থমকে দাঁড়ায়" ।।

১৮ ।। "তুমি ছিলে শুধু রঙ করা পুতুল" ।।

১৯ ।। "পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি" ।।

২০ ।। "ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে" ।।

২১ ।। "ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা" ।।

২২ ।। "আমরা সবাই রাজা" ।।

২৩ ।। "আজীবন শুধু ভুল" ।।

২৪ ।। "অনুভবে তোমারে যে পাই" ।।

২৫ ।। "পৃথিবী আবার শান্ত হবে" ।।

২৬ ।। "ভুল সবই ভুল" ।।

২৭ ।।“এসো আমার ঘরে”।।

২৮ ।। “এই পথ যদি না শেষ হয়” ।।

২৯ ।। “চোখের আলোয়...” ।।

৩০ ।। “এ কী হল?” ।।

৩১ ।। “বেওয়াফা সনম” ।।

৩২ ।।“জানে ও ক্যায়সে লোগ থে জিনকে”।।

১

।। "তারে ধরি ধরি মনে করি" ।।

পুলিশের গাড়িটা পিছু নিয়েছে বুঝতে পারল রজত।
সন্তর্পণে পিছু নিয়েছে। তার গতিবিধি দেখতে চাইছে। ধরার হলে এতক্ষণে গতি নিয়ে নিত।
রাত এগারোটা। ফাঁকা হাইওয়ে।
রজত কিছু দূর গিয়ে গাড়ির ব্রেক কষল। দেখা যাক পুলিশ সত্যিই তাকে কোন সন্দেহ করছে নাকি।
রজত অপেক্ষা করছে।
পুলিশের গাড়িটা অত্যন্ত দ্বিধা নিয়ে তার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল।
রজত কাঁচ নামাল।
জিপ থেকে একজন কনস্টেবল বলল, "কোন সমস্যা আছে?"
রজত বলল, "ছোট বাইরে করব"।
"কোথায় যাবেন?"
রজত বলল, "বোলপুর"।
"এত রাতে?"
"হঠাৎ করেই ঠিক হল"।
একজন জিপ থেকে নামল। বলল, "কাগজ দেখি"।
রজত গাড়ির কাগজ বের করল।
কাগজ দেখতে দেখতে কনস্টেবল বলল, "মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন না তো?"
রজত বলল, "আমি জীবনেও মদ খাই না"।
কনস্টেবল বলল, "এত রাতে বেরনো ঠিক হয় নি"।
রজত বলল, "বউ থাকে। একা একা বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যে নামার পর থেকে সেক্স উঠেছে, বলছে চলে এসো। বুঝলেন না?"
কনস্টেবল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এ আবার কেমন কথা?"
রজত বলল, "এই যে আপনারা রাতে বেরোন, বউ ডাকে না?"
কনস্টেবল তাকে কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "বহুত ফালতু লোক আপনি। যান যান"।
রজত হাসতে হাসতে কাগজটা নিয়ে গাড়িতে বসল।
পুলিশের গাড়িটা চলে গেল।
রজত সিগারেট ধরাল।
জানলা খুলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চল্লিশ/পঞ্চাশ কিমি বেগে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে ধীর লয়ে গাড়ি এগোতে লাগল।
কিছুটা যাওয়ার পর আবার গাড়ি দাঁড় করালো।
ডিকি খুলল।
পর্ণার লাশটা বস্তার ভিতর রাখা।
বস্তাটা বের করে সে রাস্তার পাশে ফেলে দিল। পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আরেকটু দূরে নিয়ে গেল।

ছোট একটা পেট্রোলের জার ছিল। পেট্রোল বস্তার ওপর ছড়িয়ে লাইটার দিয়ে সেটা ধরিয়ে গাড়িতে এসে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল।

জোরে গান বাজাতে হবে। গানটা দরকার।

মাথার ভেতর দিয়ে গানটা নাচানাচি করবে, সব কিছু নাড়িয়ে দেবে, নইলে মজা নেই।

শিস দিতে দিতে রজত এক্সিলারেটরে চাপ দিল।

এরকম খুনই তার পছন্দ। নিট এন্ড ক্লিন।

২

।। "মেরে মেহবুব কেয়ামত হোগি" ।।

গাড়ি চলছে। রজত গান গাইছে।
রাত বাড়লে রজতের গান শোনার নেশা চাপে।
কিশোর কুমার চলছে এখন। কিছুক্ষণ পর সেটা পালটে পুরনো বাংলা গান চলবে।
গাড়িটা সামনের একটা এক্সিট থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার কলকাতামুখী হল সে। খানিকটা রাস্তা যেতে দেখা গেল আগুনটা জ্বলছে। এখনো পুলিশ আসে নি।
পুলিশ এলে লাশটা দেখার পর ওদের চোখ মুখ কেমন হবে ভেবে রজত খুব এক চোট হেসে নিল। মানুষ হতভম্ব হবে, কী করবে বুঝতে না পেরে মাথার চুল ছিঁড়বে, তবেই না মজা!
কিছুক্ষণ পর একটা ধাবায় গাড়ি থামাল সে। বারোটা রুটি খেল মাংস দিয়ে। এক প্লেট মাংসে আট পিস থাকে। তার আট পিসে হল না। সে আরো এক প্লেট আনাল। দু প্লেট মাংস খেল। ওয়েটার অবাক হল। রজত পাত্তা দিল না। খুনের পর কতটা স্ট্রেস যায় এ ব্যাটা কী করে বুঝবে? লোকে বলে সেক্সে নাকি সব থেকে বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়।
ভুল বলে। সব থেকে বেশি ক্যালোরি যায় খুন করলে। কত চাপ। আগে সেক্স করে নাও। তারপর মেরে দাও। সেক্স+খুন=প্রচুর ক্যালোরি ক্ষয়।
এয়ারপোর্ট যেতে বেশি সময় লাগল না। রাস্তা ফাঁকাই ছিল।
এয়ারপোর্টের পার্কিং এ অ্যাপ ক্যাবের ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গাড়ি বুঝিয়ে দিল সে। ছেলেটা টাকার হিসেব দিয়ে দিল। রজত বাকি টাকা ছেলেটাকে দিয়ে আই কার্ড নিয়ে এন্ট্রান্সে গেল। নিরাপত্তারক্ষীরা তার আই কার্ড আর ই টিকিট দেখে ছেড়ে দিল। হ্যান্ড ব্যাগেজ শুধু একটা। আর কোন লাগেজ নেই। ভোরে ফ্লাইট।
চেয়ারে অপেক্ষারতা এক সুন্দরীর পাশে গিয়ে রজত বসে পড়ল। যেসব মেয়ে সেজেগুজে থাকে, তাদের রজতের ভারি ভাল লাগে। এরা দামী পারফিউম ব্যবহার করে। দামী পারফিউমের গন্ধ এদের আরো অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।
মেয়েটা একটা ব্যাগের উপর পা তুলে বসে বই পড়ছে।
রজত হালকা গলায় বলল, "সিকিউরিটি হয় নি?"
মেয়েটা তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "না, এখনো শুরু হয় নি কিছু"।
রজত বলল, "ওহ আপনি বাঙালি? আপনাকে দেখে আমার কেমন যেন ইউরোপিয়ান মনে হয়েছিল!"
মেয়েটা বলল, "ইউরোপিয়ান লাগলে বাংলায় কথা বললেন কেন?"
রজত বলল, "চান্স নিয়েছিলাম। লেগে গেল। আমি দুটো ইউরোপিয়ান ভাষা জানি। ইংলিশ আর স্প্যানিস। এর বাইরে হলে কথা বলতে পারতাম না"।
মেয়েটা বইয়ের দিকে চোখ রেখে বলল, " ওকে।"
রজত বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব রাগ করবেন না তো?"
মেয়েটা বলল, "করুন"।
রজত বলল, "এই পারফিউমটার নাম কী?"

মেয়েটা বলল, “ভেরোনিকা”।
রজত বলল, “বাহ। খুব সুন্দর নাম। আপনার বয়ফ্রেন্ড গিফট করেছেন?”
মেয়েটা বলল, “আমার বয়ফ্রেন্ড নেই। তবে ব্যাগে পিপার স্প্রে আছে”।
রজত খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, “আপনি আমাকে ওরকম কিছু ভাবছেন কি? ভুল ভাবছেন। আমি খুব ভাল ছেলে”।
মেয়েটা বলল, “দেন স্টপ ডিসটার্বিং”।
রজত বলল, “ওকে, ওকে। সরি”।
মেয়েটা উত্তর দিল না।
রজত চোখ বন্ধ করল। পুলিশ এখন কী করছে? পর্ণার পোড়া লাশটা পেয়েছে। কত কাজ এখন ওদের। বডি আইডেন্টিফিকেশন, লাশের ঠিকানা বের কর, সে কোথায় গেছিল বের কর, ততক্ষণে সে কোথায়? নিজের মনেই সে হাসতে শুরু করল। খুন হল পৃথিবীর সহজতম কাজ।
ভেরোনিকা নামের পারফিউম।
দাম কত হতে পারে? এই পারফিউমটাই শুধু মেয়েটা ইউজ করে না অন্য কিছুও ইউজ করে?
কেউ কেউ পারফিউম ইউজ করে না। কিন্তু তাদের শরীরেও একটা দারুণ গন্ধ থাকে। নেশা ধরিয়ে দেওয়া গন্ধ।
রজত নিজের মনে উচ্চারণ করতে লাগল, “ভেরোনিকা, ভেরোনিকা, ভেরোনিকা ডিসাইডস টু ডাই...”
মেয়েটা বলল, “এক্সকিউজ মি। কী বলছেন আপনি?”
রজত বলল, “কিছু না। আমার বইয়ের নাম মনে পড়ল ভেরোনিকা নামটার সঙ্গে, তাই বললাম”।
মেয়েটা বিরক্তি সূচক শব্দ করল।
রজত আড়চোখে মেয়েটার ঘাড় দেখল।
ছুরি লাগবে। ধারালো। মসৃণ ঘাড় বরাবর যদি চালানো যায়, রক্তটা ফিনকি দিয়ে এসে তার মুখে লাগবে, মাস্ক পরতে হবে ছুরি চালানোর সময়।
মেয়েটা তার দিকে অবাক চোখে তাকাল, “কী দেখছেন”?
রজত বুঝল মেয়েটা বুঝেছে সে তার দিকে তাকাচ্ছে। সে বলল, “কিছু না। আমি ওই খাবারের দোকানগুলো দেখছিলাম। আপনি কিছু খাবেন?”
মেয়েটা কড়া গলায় বলল, “নো এন্ড প্লিজ লিভ মি এলোন, নইলে আমি ব্যবস্থা নেবো”।
আহ, রাগী মেয়ে! এরকম মেয়েদের খুন করে ভারি মজা পাওয়া যায়। রজত উঠল।

৩

।। "আজ নিশীথে, কাছে থাকো, না বোলো না।।

রজত দূরে গিয়ে বসেছে। মেয়েটার দিকে আর দেখছেও না।
এটাই নিয়ম।
মেয়েটা পাত্তা অবশ্যই চায়। কিন্তু স্টকিং পছন্দ করে না।
একটা বড় কফি নিয়ে এসে ধীরে ধীরে কফিটা শেষ করছে।
দামী কফি এরকমই হয়। গাদাগুচ্ছের দাম হবে, অথচ খেলে মনে হবে উটের হিসি।
রজতের ইচ্ছে আছে জীবনের শেষ খুনটা এরকম এয়ারপোর্টের লবির মত খোলামেলা জায়গায় করবে। খুনটা যে একটা শিল্প, সেটা মানুষের জানা দরকার। মানুষ জানতে পারে না। পৃথিবীর বহু খুনী দরকার তার ভার কমানোর জন্য। রাষ্ট্রনায়কদের এই দলে ফেলা যায়। তাদের হাতে যখন ক্ষমতা চলে আসে... অপরিসীম ক্ষমতা, তখন তারা মানুষ মারাটা আর্ট হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। সামান্য কোন অনুঘটক পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ মারতে শুরু করে দেয়। সে আমেরিকা হোক কিংবা রাশিয়া। একবার রক্তের নেশা চলে এলে আর সব নেশা ফিকে হয়ে যায়।
খুন ব্যাপারটাকে অহেতুক অপরাধের পর্যায়ে ফেলা হয়। এই নিয়মটা তৈরী করেছে মানুষ। মানুষ তার সুবিধামত অনেক নিয়ম তৈরী করেছে। এটাও তার অন্যতম। মানুষ অন্য প্রাণী মেরে খেয়ে ফেলছে, অথচ নিজেকে মারতে পারবে না। আজব সব যুক্তি। সবার আগে এসব যুক্তির নির্বাসন হওয়া প্রয়োজন।
খুনের রাতে রজতের ঘুম আসে না। একটা উত্তেজনা কাজ করে। কোন এক আশ্রয়ে গিয়ে দুটো কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। এটা নিয়ে সে ভেবেছে। এটা হওয়া উচিত না।
খুন কোন অপরাধ না, এটা তার মন মেনে নিয়েছে। তাহলে শরীরে উত্তেজনা আসা কোন কাজের কথা না। মানুষের শরীরে রক্ত থাকবেই, সেটা ছিটকে চোখে মুখে লাগলে কেন অহেতুক উত্তেজনা হবে? মজা তো তখন লাগে, যখন যাকে খুন করা হবে, সে অবাক চোখে তাকাবে।
পর্ণা যেমন। পর্ণার গলায় ছুরিটা চালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে পর্ণা অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। কত প্রশ্ন!
পর্ণার পারফিউমটার নাম মনে করার চেষ্টা করল রজত। মনে পড়ছে না। বেশ দামী পারফিউম। হাইওয়ের ধারে মেক আউট করার প্ল্যানটা রজত করেছিল। প্রথমে ভেবেছিল গ্যাংটকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ছুরিটা চালাবে, পরে ভেবে দেখল অত সময় নেই। কাউন্ট বাড়াতে হলে অত সময় নেওয়া যাবে না। পর্ণাকে তুলতেও অনেক এফোর্ট দিতে হয়েছিল। কত ঝামেলা! ক্লাবে যতবার যেত, পর্ণা ঠিক হাত ফসকে বেরিয়ে যেত।
এটাই ভাল লাগত রজতের। সেই শিকারেই তো মজা বেশি, যে শিকার জালে আসতে দেরী করে। এই মেয়েটা কোথাও একা যাচ্ছে। কী আগে পাচ্ছে তার? সেক্স না খুন?
রজত বোঝার চেষ্টা করল।
পর্ণার লিপস্টিকের গন্ধটা ভাল ছিল। চুমু খেতে খেতে জিজ্ঞেসও করে ফেলেছিল "এটা কোন কোম্পানির লিপস্টিক?"
পর্ণা তার পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলেছিল, "জাস্ট শাট আপ এন্ড ফাক"।

হাইওয়ে ধরে নেমে যাওয়া গাড়ি। হাইওয়েতে একের পর এক গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ চুমুটা খেতে খেতেই পর্ণাকে চমকে দিয়ে গাড়ির সিটের তলা থেকে ছুরিটা বের করেছিল সে। মুহূর্তের মধ্যে ছুরিটা চলল।

পর্ণা কাটা পাঠার মত ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে গেল। রজতের গাড়িতেই পরিষ্কার হয়ে নেওয়ার সব কিট থাকে। আধ ঘন্টাখানেক সময় লাগল। গাড়িতে এখনো রক্তের দাগ থাকবে। থাকুক।

তার কিছুটা সময় লেগেছে নিজেকে সাফ করতে। ড্রেস চেঞ্জ করতে। রাস্তায় উঠে পুলিশের সামনে নিজেকে ঠান্ডা রাখতে হয়েছে। হবেই তো। এগুলোই তো চ্যালেঞ্জ।

ভেরোনিকা শব্দটা আবার মাথায় আসতে শুরু করল।

রজত উঠল। বাথরুম গেল। আরেকবার নিজেকে ভাল করে দেখল। নাহ। কিচ্ছু নেই।

নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিল সে। দিন দিন পারফেক্ট হয়ে উঠছে সে। একজন দুর্দান্ত শিল্পী!

এটাই তো দরকার!

৪

।। “রাত আকেলি হ্যায়” ।।

জলের বোতলে মদ পাঞ্চ করে খাচ্ছিল কৌশিক। কনস্টেবল সিধু বেরা বাদাম কিনে এনেছে। বলল, “স্যার ছোট মুখে বড় কথা বলছি, আপনি কিন্তু আজকাল খুব বেশি টানছেন”।
কৌশিক সিগারেট ধরিয়ে বলল, “বড় বড় ডিটেকটিভরা সিগারেট খায় বুঝলে? আমি না হয় মদ খাই। কী আছে এই জীবনে?”
সিধু বলল, “তাও স্যার। এত খাওয়াও ঠিক না। লিভার ফেটে যাবে এবার”।
কৌশিক খ্যাক খ্যাক করে হাসল।
ওয়্যারলেসে বার্তা এল, “হাইওয়ের পাশে আগুনে লাশ পুড়ছে। স্যার, স্যার”।
কৌশিক ফোন বের করে প্যাট্রোলিঙ টিমকে ফোন করল। বলল, “কী হয়েছে? লাশ পুড়ছে মানে?”
“স্যার বস্তায় বেঁধে একটা লাশ কেউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুড়েই গেছে প্রায়”।
কৌশিক হতভম্ব গলায় বলল, “তুমি শিওর লাশ যে?”
“হ্যাঁ স্যার”।
কৌশিক ফোন রেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, “চল, চল”।
সিধু বলল, “স্যার বোতলটা”?
কৌশিক বলল, “নিয়ে চল”।
জিপে উঠে কৌশিক বিরক্ত গলায় বলল, “রাত বিরেতে আজকাল এসব শুরু হয়েছে। এ আমাদের ঘাড়েই পড়বে সিধু”।
সিধু বলল, “কী আর করবেন স্যার, মেনে নিতে হবে। ডিউটি যখন”।
রাস্তার পাশে প্যাট্রোলিং কার দাঁড় করানো আছে। লাশটা পুড়ছে। কৌশিক গাড়ি থেকে নেমেই বলল, “আরে, একি আইনক্সে সিনেমা চলছে নাকি? জল দাও। কোথায় সব?”
খানিক দূরে পুকুর। বালতিতে করে জল এনে নগ্ন জ্বলন্ত লাশের গায়ের আগুন নেভানো হল। কৌশিক মুখ বিকৃত করে সেদিকে তাকিয়ে রইল, “ঈশ। কোন শুয়োরের বাচ্চার কাজ এটা? এই সিধু, বোতলটা দাও”।
সিধু ইতস্তত করছিল। কৌশিক সিধুর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে অনেকটা খেয়ে নিল। বলল, “ফরেন্সিকে খবর পাঠাও। আর কোন চাদর থাকলে লাশটা জড়াও। চোখে দেখা যাচ্ছে না”।
কৌশিক ফোন বের করল, নাম্বার ডায়াল করল উপরওয়ালার। একবার রিং হতেই ফোন তুলল এস পি সাহেব, “বল”।
কৌশিক বলল, “স্যার, একটা লাশ পাওয়া গেছে হাইওয়ের পাশে। কেউ বস্তায় করে নিয়ে এসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে”।
এস পি বললেন, “ওহ, সবে ঘুমোলাম। এখনই এই নিউজ? মেরে পুড়িয়েছে না পুড়িয়ে মেরেছে?”
কৌশিক নিজের মনে একটা খিস্তি মেরে বলল, “সেটা ল্যাব বলুক। আমি ফরেন্সিকে পাঠাচ্ছি”।
“ঠিক আছে। পাঠাও। জানোয়ারে ভরে যাচ্ছে চারদিক”।
“হ্যাঁ স্যার”।

ফোন কেটে কৌশিক সিগারেট ধরাল।
গাড়িতে একটা বস্তা ছিল। সেটা বের করে কেটে যতটা পারা যায় লাশটা ঢাকা দেওয়া হল। কৌশিক গাড়িতে গিয়ে বসল। সিধু এসে বলল, “কী করব স্যার? থানায় যাবো?”
কৌশিক চিৎকার করল, “গিয়েই ঘুমাবে তাই তো? দেখছো এখানে গাঁড় মারা যাচ্ছে, কোথাকার কোন শুয়োর এভাবে মেরে গেছে, থানায় যেতে ইচ্ছা করছে?”
সিধু ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গেল। কৌশিক আঙুল দিয়ে কপাল চেপে ধরে বসল।
হাত কাঁপছে তার। সকালেই হাইওয়েতে একটা এক্সিডেন্ট দেখেছে। এক বাইক আরোহীকে একটা লরি পিষে দিয়েছিল। সেটা ভুলতে মদ নিয়ে বসেছিল। এখন আরেকটা লাশ। চোখে দেখা যাচ্ছে না। কৌশিক পকেট থেকে মাথা ধরার ট্যাবলেট বের করে খেল।
অসহ্য এক চাকরি। বয়স পেরিয়ে গেছে। কে তাকে আর অন্য চাকরিতে নেবে?
ফরেন্সিক টিম এসে কাজ শুরু করল। ফরেন্সিকের সত্যজিৎ তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, “এটা চাকরি না ওয়েব সিরিজ ভাই?”
কৌশিক বলল, “ওরকমই কিছু হবে। মদ খাবি?”
সত্যজিৎ বলল, “দে। ভাল লাগে না আর”।
কৌশিক সত্যজিৎকে বোতলটা দিল। সত্যজিৎকে বোতলটা খেতে দেখে সিধু দূর থেকে চোখ পিটপিট করে তাকাল।
সত্যজিৎ বলল, “মুখটা থর‍্যাশ করে দিয়েছে। লাশটা কোন মেয়ের। মালটা খুনী না সাইকো?”
কৌশিক বলল, “ফ্রাস্ট্রেটেড সাইকো। চারদিকে এরকম মাল ভরে যাচ্ছে। কী করে বাড়ছে ভাই?”
সত্যজিৎ বলল, “যেভাবে তোর ফ্রাস্ট্রেশন বাড়ছে। মদ গিলে ফ্রাস্ট্রেশন দূর করছিস, কোনদিন দেখা যাবে খুন করে ফ্রাস্ট্রেশন দূর করছিস”।
সত্যজিৎ জোরে হাসল। সবাই তাদের দিকে তাকাচ্ছে।
কৌশিক বলল, “খুনটা তোকে দিয়েই শুরু করব দেখিস। এ শোন, আমার পোষাচ্ছে না। আমি থানায় যাই। কী সব সই সাবুদ করতে হয় করিয়ে নে”।
সত্যজিৎ মাথা নাড়াল, “না বাপ। তোমার প্রেজেন্স ইজ মাস্ট। থাকো থাকো”।
কৌশিক বিরক্ত মুখে সত্যজিতের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বলল, “শালা সাইকোটা কোথায় কী করছে কে জানে!”

৫

।। “আই অ্যাম দ্য বেস্ট” ।।

একটা মস্কোগামী ফ্লাইটের খবর এল।

রজত অবাক হল। বাওয়া! কলকাতা থেকে লোকে মস্কোও যায়? মস্কোর খুনীরা কি তার মত পারফেক্ট খুনী হয়?

না বোধহয়। ব্যাপারটা এত সোজা না। সে এক, অভিন্ন। তাকে খুঁজে বের করা অত সোজা না। এই ডিজিটাল যুগেও সে যেভাবে অপারেট করে, সেভাবে অপারেট করা সবার কম্মো নয়। সেই সেরা। সেরা হবার অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত। একজন খুনী কীভাবে সেরা হবে?

১) কোন রকম ক্লু পেছনে থাকবে না-

সে রাখে না। সে ছদ্মবেশে থাকে। অসংখ্য আইডেন্টিটি তৈরি করে রাখে। মেয়েরা সত্যিটা বিশ্বাস করে না। সাজানো মিথ্যা বেশি বিশ্বাস করে। সে এই ব্যাপারে সেরা।

দু নাম্বার নিয়ে ভাবতে গিয়ে চোখ বন্ধ করেছিল রজত, হঠাৎ শুনল, “এক্সকিউজ মি”।

সেই মেয়েটা।

রজত মনে মনে হাসল। এরকমই হয়। দূর করতে করতে এভাবেই এরা কাছে চলে আসে।

রজত বলল, “বলুন”।

মেয়েটা বলল, “আমার ভোর পাঁচটার বাগডোগরার ফ্লাইট আছে সুপার এয়ারওয়েজ থেকে। এখানে একটা নোটিফিকেশন দেখছি ফ্লাইট ডিলে হতে পারে। আমি ওদের ওখানে গিয়ে কাউকে পেলাম না। আপনি কোন হেল্প করতে পারবেন?”

রজত মনে মনে আবারও হাসল। মামণি ঘ্যাম নিতে চেয়েছিল অথচ এয়ারপোর্টের রকম সকম বেশি জানে না। সে বলল, “শিওর। আপনি বসুন। আমি দেখে আসছি”।

মেয়েটা কৃতজ্ঞমুখে বসল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটার কাছে এসে রজত বলল, “না ডিলে হয় নি। ফ্লাইট রাইট টাইমেই ডিপারচারে আছে”।

মেয়েটা হাঁফ ছাড়ল, “থ্যাংক ইউ”।

রজত বলল, “আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন কেন?”

মেয়েটা বলল, “ভোরে ওঠা সমস্যার, তাই”।

রজত মাথা নাড়ল, “আচ্ছা আচ্ছা”।

মেয়েটা তার পাশেই বসল। রজত আবার চোখ বন্ধ করল। একটা স্টেপ এগনো গেছে এবং খুব কাকতালীয়ভাবে ব্যাপারটা তার দিকে এসেছে। খুব স্বাভাবিক থাকতে হবে, দাঁত ক্যালালে চলবে না।

মেয়েটা বলল, “আমি অনন্যা”।

রজত বলল, “আমি রজত। আপনি শিলিগুড়িতেই থাকেন?”

অনন্যা বলল, “না, আমি সিকিমে চাকরি করি”।

রজত বলল, “আচ্ছা। আমিও শিলিগুড়িই যাচ্ছি”।

অনন্যা বলল, “সুপার এয়ারওয়েজেই”?

কৌশিক বলল, “হ্যাঁ”।
অনন্যা বলল, “আমি এই প্রথম এয়ারপোর্টে রাত কাটাচ্ছি, বাবা বার বার বারণ করেছিল, আমি শুনি নি। ভাই টিকিট কেটেছে, ওকে বলেছিলাম সস্তার টিকিট কাটতে, টাইম দেখে নি মাঝখান থেকে। ভয়ের কিছু নেই, বলুন?”
রজত বলল, “না না। কোন চাপ নেই। সিকিমে কোথায় চাকরি করেন?”
অনন্যা বলল, “গ্যাংটকে। রামপাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই”।
রজত বলল, “বাহ বাহ। খুব ভাল। গ্যাংটকের ডিরেক্ট ফ্লাইট আছে না?”
অনন্যা বলল, “আছে, তবে ওটা মাঝে মাঝে ক্যান্সেল হয়ে যায়। রিস্ক নিলাম না। আচ্ছা শুনুন, আপনার সঙ্গে একটু রুড বিহেভ করে ফেলেছিলাম। সো সরি”।
রজত বলল, “ না না, ইটস ওকে। রুড থাকা ভাল। একা যাচ্ছেন। ঠিক করেছেন”।
অনন্যা বলল, “থ্যাংক ইউ”।
অনন্যা বইটা পড়তে শুরু করল আবার।
রজত খুশি হল। একেই বলে সবুরে মেওয়া ফলে। যত সময় দেওয়া যায়, যত কম অধৈর্য হওয়া যাবে, মেয়েটা তত তার জালে পড়তে থাকবে।
এখন ছিপ ছাড়ার দ্বিতীয় ধাপ। একবারে আগ্রহ দেখানো যাবে না। ঘুমানোর ভান করতে হবে। এদিকে ঘুম হবে না।
এয়ারলাইনস কোম্পানির সুন্দর সুন্দরী ছেলে মেয়েরা কাউন্টারে কাজ করছে। দেখেও ভাল লাগে। মেয়েরা কী সব মেক আপ দিয়েছে, দামী লিপস্টিক।
ওই যে একবারে কোণায় মেয়েটা যাত্রীদের চেক ইন করাচ্ছে, মেয়েটার গলাটা লম্বা। লম্বা মুখ। চোখ বড় বড়। এরকম মেয়েদের শ্বাসরোধ করে মারার সময় চোখ আরো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। রজত তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল।
নিয়ম বলছে, অনন্যা এখন মাঝে মাঝে তাকে আড়চোখে দেখবে। সে যদি অন্য মেয়েদের মাপে, তাহলে অনন্যা বুঝে যাবে। সেক্ষেত্রে বিরাগ জন্মাতে পারবে।
মেয়েরা সবার আগে চায় কমিটমেন্ট। বাচ্চা ছেলেগুলো সেটাই বোঝে না। পাসওয়ার্ড দাও, এই দাও, সেই দাও করে শুরুতেই ক্যাচাল বাধিয়ে দেয়।
রজত আরেকবার উঠে বাথরুমে গেল।
আয়নার সামনে দাঁড়াল।
পারফেক্ট! কী সুন্দর দেখতে তাকে। নিজেই বার বার নিজের প্রেমে পড়ে যায় সে। মেয়েদের আর দোষ কী?

৬

।।“নীল আকাশের নীচে”।।

“তোর কনস্টেবলগুলো কত করে কামায়? তোর কাছে কত দেয়?”
সিগারেট টেনে প্রশ্ন করল সত্যজিৎ।
মদ শেষ হয়ে গেছে। সিধুকে আরেকটা বোতল আনতে পাঠিয়েছে কৌশিক।
বড় সাহেব আসবে বলেছেন। তাই তারা স্পট ছেড়ে যেতে পারে নি।
কৌশিক বলল, “তোর ধারণা লরির দশ বিশ যোগ করে আমি কোটিপতি হয়ে গেছি? এসব ধারণা কোত্থেকে পাস ভাই?”
সত্যজিৎ বলল, “কাম অন ইয়ার। সত্যিটা বল। কী হবে?”
কৌশিক বলল, “আমি নিই না”।
সত্যজিৎ হেসে উঠল, “ঢপ মারার জায়গা পাস না? বেড়াল বলে মাছ খাবো না? মাইরি!”
কৌশিক বলল, “স্যারের সঙ্গে কথা বলব? পজিশন সোয়াইপ করবি? চলে আয়, দ্যাখ ভাল লাগবে। সমস্যা বেশি নেই, মাঝে মাঝে দু চারটে শুট আউটে টপকে যাওয়ার চান্স থাকবে এই যা!”
রাস্তা দিয়ে একটা ওভারলোড ট্রাক যাচ্ছিল। কনস্টেবলরা দাঁড় করাল। অন্ধ্রের ট্রাক। ট্রাক ড্রাইভারকে নামিয়ে কাগজ চেক করা চলছে।
সত্যজিৎ বলল, “এখনই তো পাঁচ হাজার পাবি। পাবি না?”
কৌশিক মুখ বিকৃত করে বলল, “শোন ভাই। রাত যথেষ্ট হয়েছে। চুলকাস না। আমিও চুলকাতে জানি। একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পালটে আমাদের থেকে অনেক বেশি কামাতে পারিস তোরা। গল্প শুরু করলে আমিও শুরু করতে পারি। করব?”
সত্যজিৎ রেগে গেল, “কে বলে এরকম অশিক্ষিতর মত কথা? এত সোজা সব কিছু?”
কৌশিক বলল, “বললাম তো, অহেতুক কোন বিষয় নিয়ে চুলকাস না। একটা লাশ পড়ে আছে, সেটা নিয়ে ভাব”।
সত্যজিৎ বলল, “ভাবব। ভাবতে হবে। সেটাই আমাদের কাজ। তোদের আর কী কাজ? আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে মিটে গেল”।
সিধু মদ নিয়ে এসেছে। কৌশিক বোতলটা নিয়ে জলের বোতলে মিশিয়ে নিয়ে একাই খেতে শুরু করল।
সত্যজিৎ বলল, “আমাকেও দিস”।
কৌশিক বলল, “ট্রাকের ঘুষের টাকায় কেনা মদ খাস না। অনুসন্ধান ঘোলাটে হয়ে যাবে”।
সত্যজিৎ কৌশিকের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে বলল, “কিসসু হবে না। দে তো”।
এস পি সাহেবের গাড়ি চলে এসেছে। কৌশিক তড়িঘড়ি সত্যজিতের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে সিধুকে বলল, “সরিয়ে দাও”।
এস পি বীরেশ সাউ এসে গাড়ি থেকে নেমে সোজা স্পটে চলে গেলেন। লাশটা দেখে কোমরে হাত দিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে বললেন, “টেরিবল”।
সত্যজিৎ বলল, “হ্যাঁ স্যার”।

এস পি বললেন, "প্রেসে যাবে। এ আটকানো যাবে না। প্যাট্রলিং কারের রিপোর্ট আর ক্যামেরাগুলোর ক্লিপ দেখো কৌশিক। শর্ট লিস্টিং শুরু করেছো কিছু?"
কৌশিক বলল, "না স্যার। এখনো কিছু শুরু হয় নি"।
এস পি বললেন, "এই স্পটের সামনে পিছনে সিসিটিভিগুলো দেখো। কোন কোন গাড়ি ইউ টার্ন নিয়েছে দেখো। টাইম স্ক্যান কর। পারবে, না আমাকে থাকতে হবে? আর ডিউটি আওয়ার্সে মদ খেয়েছো কেন?"
কৌশিক বলল, "কী করব স্যার? সবে তো শুতে গেছিলাম!"
এস পি বললেন, "স্টপ মেকিং এক্সকিউজেস। মদ খাওয়াটা কোন কাজের কথা না। তোমার কি মনে হয়? খুনটা করে খুনীটা খোলা বাজারে ঘুরে বেড়ালে সেটা নিরাপদ? আমাদের ফ্যামিলির লোকেরাও তো এদের পাল্লায় পড়তে পারে, তাই না?"
কৌশিক বলল, "ছাড়বার প্রশ্নই নেই স্যার। আপনি ইন্সট্রাকশান দিন স্যার। যেভাবে বলবেন, সেভাবেই কাজটা এগোবে"।
এস পি সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা বেরিয়ে যাও। আমি কৌশিকদের সঙ্গে আছি"।
সত্যজিৎ এস পি সাহেবকে আড়াল করে কৌশিককে চিমটি কাটল। কৌশিকও পালটা চিমটি কাটল।
কিছুক্ষণের মধ্যে বডি নিয়ে সত্যজিৎরা বেরিয়ে গেল।
এস পি বললেন, "আলো নিয়ে এসো। যে ক'টা টর্চ আছে সব। ভোরের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। দেখি, নিয়ে এসো"।
কৌশিক কনস্টেবলদের ডাকল। সবাই স্পটের কাছে টর্চ জ্বালিয়ে জায়গাটা আলোকিত করল। মাটিতে কালচে কালচে ছোপ। পোড়া গন্ধটা বড্ড নাকে লাগছে।
এস পি সাহেব হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে তর্জনী দিয়ে টিপে টিপে দেখতে শুরু করলেন। কৌশিকও বসল। মেয়েটার দেহ পোড়া গন্ধটা হঠাৎ এমনভাবে তার নাকে লাগল, সে ওখানেই বমি করে দিল।

৭

।। "বড় একা লাগে, এই আঁধারে" ।।

অনিমেষের ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। পিন্টো চিৎকার করছে। উঠে মুখ বিকৃত করল সে।
সোফায় শুয়েছিল। টিভিটা চলছে। অনিমেষ টিভি বন্ধ করল। পর্ণা এখনো ফেরেনি?
পর্ণার কাছে ঘরের চাবি থাকে। এতক্ষণে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ার কথা।
অনিমেষ পর্ণার ঘরে গেল। বাথরুমও দেখল।
নাহ, নেই।
একবার কি পর্ণাকে ফোন করা দরকার? কী করা উচিত? ফোন করলে কি ওর স্বাধীনতাটা চলে যাবে?
একবার বলেছিল বটে ওর স্বাধীনতায় হাত না দিতে। ঘড়িটা দেখে ফোন করারই সিদ্ধান্ত নিল সে।
ফোন নট রিচেবল বলছে। অনিমেষ কয়েক সেকেন্ড ভেবে রিচাকে ফোন করল। রিচা ঘুম ঘোরে ফোন ধরল, "হ্যাঁ অনিমেষ, কী হয়েছে?"
অনিমেষ বলল, "পর্ণা ফেরেনি, কিছু জানায়ও নি। কোথায় আছে বলতে পারবে?"
রিচা বলল, "ও তো ব্যাঙ্ক থেকে তাড়াতাড়িই বেরোল আজ। বলেছিল তোমার জন্মদিন আছে"।
অনিমেষ অবাক গলায় বলল, "আমার জন্মদিন? তা হবে হয়ত"।
রিচা বলল, "হবে হয়ত মানে? এ কেমন কথা? তুমি জানো না তোমার জন্মদিন নাকি?"
অনিমেষ বলল, "না মানে সেরকম ব্যাপারটা না। আমি নিজেও ভুল গেছিলাম আমার জন্মদিন কবে। তবে পর্ণা এখনো ফেরে নি"।
রিচা বলল, "তুমি পুলিশে ফোন কর তাহলে। সেটাই বেটার হবে। অনেক রাত হয়েছে"।
অনিমেষ বলল, "ফোন করব? ও রাগ করবে না তো?"
রিচা বলল, "রাগ কেন করবে? রাত হয়েছে বাড়ি ফেরে নি। বাপের বাড়ি তো এখানে না। এখানে হলে ভাবা যেত"।
অনিমেষ বলল, "ঠিক আছে"।
ফোনটা কেটে সে ফোন বুকে স্থানীয় থানার নম্বর খুঁজতে বসল। পাওয়া গেছে। পর্ণাই নাম্বারটা খাতায় লিখে রেখেছিল।
ও প্রান্তে ফোন ধরল কেউ, "হ্যালো"।
অনিমেষ বলল, "আমার বউ এখনো বাড়ি ফেরে নি। কী করা যায়?"
"মিসিং ডায়েরী করবেন? থানায় চলে আসুন"।
"এখন?"
"তো কখন? আপনিই তো বললেন আপনার ওয়াইফ ফেরেন নি"।
"আচ্ছা। আমি আসছি"।
অনিমেষ ফোন রেখে তৈরী হয়ে নিল। পিন্টোর চিৎকার কমে নি। অনিমেষ লজ্জা পেল। বেচারা খায় নি। সে তাড়াতাড়ি খাবার দিল পিন্টোকে। পিন্টো খেতে খেতে চুপ করে গেল।
অনিমেষ দরজায় তালা দিয়ে বেরোল। পর্ণা স্কুটি কিনেছিল কিছুদিন আগে। তার এই স্কুটি চালানো নিষেধ।

পর্ণার অনেক কিছুতেই তার হাত দেওয়া নিষেধ। রাস্তা ফাঁকা। অনিমেষ স্কুটিতে জোর দিল। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ তাকে আটকাল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান"।
অনিমেষ স্কুটি দাঁড় করাল।
"এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন"?
অনিমেষ বলল, "থানাতেই যাচ্ছি।"
"অ। কী হয়েছে?"
"আমার বউ ফেরেনি এখনো। রিপোর্ট করতে যাচ্ছি"।
পুলিশ তাকে আগা পাশতলা দেখে বলল, "কোথায় গেছিল?"
অনিমেষ বলল, "অফিস থেকে ফেরে নি"।
"ঠিক আছে। যান"।
অনিমেষ স্কুটি স্টার্ট দিল। থানার সামনে এসে স্কুটি দাঁড় করিয়ে সে ধীর পায়ে থানায় ঢুকল।
থানায় বেশি লোক নেই। সে বলল, "আমি ফোন করেছিলাম। আমায় আসতে বলা হয়েছে। আমার ওয়াইফ অফিস থেকে ফেরেন নি"।
তাকে বসানো হল। এফ আই আর নেওয়ার লোক বাইরে গেছেন। একটা ফোনে ফোন আসছে পর পর। মশা আছে। অনিমেষ মশা মারতে ব্যস্ত হল। ডেঙ্গির ভয় দেখাচ্ছে পুরসভা।
আরেকবার পর্ণার ফোনে চেষ্টা করল সে। এবারেও নট রিচেবল বলছে।
"এদিকে আসুন"।
একজন বয়স্ক মত লোক তাকে ডাকল। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গেল।
"কী হয়েছে বলুন?"
অনিমেষ বলল, "ওয়াইফ মিসিং। অফিস থেকে দশটার মধ্যে ফেরে। এখনো ফেরে নি"।
"দশটা? এখন ক'টা বাজে? এতক্ষণ কী করছিলেন?"
"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে খেয়াল হল এখনো ফেরে নি"।
"তাই? আপনাকে বিশ্বাস করব কী করে?"
অনিমেষ বলল, "মানে বুঝলাম না"।
"আপনি বসুন। ওসি সাহেব বেরিয়েছেন। ফিরে আসুন। তারপর কথা বলছি"।
"ঠিক আছে"।
অনিমেষ আবার বেঞ্চে বসল। ঘড়ির শব্দটা কানে লাগছে। টিক টিক টিক টিক করে বেজে যাচ্ছে ঘড়ি। বয়স্ক ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আরেকজন যুবক পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। অনিমেষের ঘুম পাচ্ছিল। বয়স্ক ভদ্রলোক তার পাশে এসে বসল, "আপনি কী করেন?"
অনিমেষ বলল, "আমি চাকরি করতাম"।
"এখন?"
"এখন কিছু করি না।"
"স্ত্রীর নাম? কী করেন?"
অনিমেষ নাম বলল।
ভদ্রলোক তার আপাদমস্তক দেখে বলল, "বউ ঘুরে বেড়ায় রাত দশটা অবধি, আপনি কিছু বলেন না?"
অনিমেষ বলল, "ওর অফিস থাকে তো। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। ফিরতে সময় লাগে"।
ভদ্রলোক বলল, "ও। তা আপনি নিশ্চিত উনি ফিরবেন না?"
অনিমেষ বলল, "আমি ওর বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। উনিই বললেন থানায় আসতে"।
ভদ্রলোক বলল, " অ। বন্ধু না বান্ধবী?"

অনিমেষ বলল, “বান্ধবী।”
“তাও ভাল। বসুন, আর কী। ম্যাদামারা ছেলে, বউ তো যাবেই”।
“হ্যাঁ? কিছু বললেন?”
“না না। বসুন”।
“ঠিক আছে”।

৮

।। "ইয়ে তো হোনা হি থা" ।।

একটা বিবাহিত মেয়ে, সে যত সুন্দরই হোক, একটা সময় একাকীত্বে ভুগতে থাকে। ছোট থেকে সুন্দর, সুন্দর করে সবাই তোল্লা দেবে, তারপর বিয়ের পর যেই মেয়েটার সঙ্গে তার বরের শোয়া হয়ে যাবে, মেয়েটার সব রহস্য বেরিয়ে যাবে, ওর বর ক'দিন পর মেয়েটাতে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। সব পুরুষ সমান হয় না, তবে বেশিরভাগ পুরুষই আদর করার সময় বউকে অন্য কোন মেয়ে ভেবে আদর করবে। তারপর আদরও কমতে থাকবে।

রজত বোঝে ঠিক কখন ছিপটা ফেলতে হবে। ছিপের উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। শুধু ছিপ ফেললেই হয় না, ভাল খাবার রাখতে হয় মাছের জন্য। মাছ প্রথমে কিছুতেই ধরা দেবে না। হাজারবার সন্দেহ করবে, দূরে দূরে চলে যাবে, তাকে পরখ করবে বার বার। সে সময় নিস্পৃহ থাকতে হবে। বোঝাতে হবে শুধুই মেয়েটার শরীরটা না, একজন ভাল বন্ধু চাই তার।

মেয়েটা ভাঙতে শুরু করে। সংসারের যাতাকলে পিষতে পিষতে মেয়েটা একটা এসকেপ রুট খুঁজতে শুরু করে। কিছু কিছু মেয়ে ভীষণ, ভীষণ রক্ষণশীল হয়। তাদের ডিফেন্স ভাঙা এক সময় অসম্ভব মনে হয়। রজত জানে, আসল ব্যাপার লুকিয়ে আছে সেই মাছ ধরার মধ্যে। খাবার দাও, দিতে থাকো। না খেলেও হাসি হাসি মুখে বসে থাকো।

পর্ণার বর একটা ভেড়া। ব্যক্তিত্বহীন একটা লোক। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। রজত ভেবেছিল পর্ণার ডিফেন্স ভাঙা সোজা হবে। আদতে দেখা গেল, তা নয়। নানা ভাবে দোনা মনা করতে শুরু করল। রজত বুঝল সংসারটা পর্ণাই চালায়। কোথাও গিয়ে একটা দায়িত্ব বোধ তাকে বাধা দিচ্ছে এসব করতে।

সে তৎক্ষণাৎ স্টান্স চেঞ্জ করল। শেন ওয়ার্ন যখন শচীনকে রাউন্ড দ্য উইকেট বল করবে ঠিক করেছিল, শচীন যেভাবে স্টান্স চেঞ্জ করেছিল, ঠিক সেভাবে। উইকেটটা ছেড়ে দিল।

রজত বোঝাতে শুরু করল সে বড্ড একা, অসহায় একজন মানুষ। পর্ণার খুব সামান্য আদরের স্পর্শ তার জীবনটাকে পালটে দিতে পারে।

রজত খানিকটা বাঘের মতও। একজন লক্ষ্য হয়ে থাকলে সে বাকি কাউকে দেখবেও না। এই সময় নয়না চলে এল।

হাতে একটা সিঙ্গল মল্ট, ক্লাবে ভিড় কম, নয়না এসে তাকে বলল, "তুমি পর্ণার পিছনে লেগেছো কেন?"

রজত ভ্রূ কুঁচকালো। বলল, "আমি? তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে"।

নয়না বলল, "আজ কিছু কাজ ছিল বাড়িতে। একা পারব না। যাবে?"

রজত দেখল ক্লাবে পর্ণা এসেছে। পিছন পিছন তার ভেড়া স্বামী। সে বলল, "না গো। আজ একটা কাজ আছে আমার। পরে কোন দিন?"

নয়না বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল, "পারবে না। পর্ণা আনব্রেকেবল"।

মলের পার্কিং লটে পর্ণার প্যান্টি নামিয়ে দিতে দিতে রজত মনে মনে হেসেছিল। আনব্রেকেবল নাকি! বর ধ্বজভঙ্গ হলে সব মেয়ে ব্রেকেবল। কায়দা জানতে হবে। তার মত ক'জন আছে? পর্ণার শীৎকারের সঙ্গে ওর স্তনবৃন্তে জিভ বোলাতে বোলাতে রজত একটা কথাই মনে মনে বলে গেছে, "আই অ্যাম দ্য

বেস্ট, আই অ্যাম দ্য বেস্ট"।
পর্ণা তার বুকে মাথা গুঁজে বলেছে, "আমি অনিমেষকে ছেড়ে দেব। ওকে মাস গেলে কিছু টাকা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে?"
রজত বলল, "তাই কোর সোনা। দেখি জিভটা দাও"।
পর্ণা তার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে। ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়রা যখন আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন ধ্বংসাত্মক হয়ে যায়। পর্ণাও তাই হতে শুরু করল। হোটেল, অফিস ফেরতা গাড়ির ভেতরে, সিনেমাহলে যেখানে সেখানে তারা শুরু হয়ে যেত। তবু জায়গা আর সময়ের অভাব। পর্ণা বলল, "আমি টানা তিনটে দিন তোমাকে চাই। কী করবে কর"।
রজত বলল, "গ্যাংটক যাবে? ম্যানেজ হবে বাড়িতে?"
পর্ণা সাগ্রহে রাজি হল। ঠিক ছিল বাগডোগরা পৌঁছে অনিমেষকে জানাবে। অফিস থেকে পর্ণা বেরোতে রজত ওকে গাড়িতে তুলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরল।
পর্ণা অবাক হল, "কী হল"?
রজত বলল," গাড়িতে করেই যাব। সারারাস্তা যখন খুশি তোমাকে আদর করব"।
গিয়ারের উপর রজতের বাঁ হাত ছিল। পর্ণা সে হাতটা ধরল। খানিকটা গিয়ে রজত গাড়িটা রাস্তার বাঁ দিকে খানিকটা নামিয়ে দিল। পর্ণা বলল, "এখানেই?"
রজত হাসল, "আমি আর পারছি না বেবি"।
আদরে আদরে পরস্পরকে ছারখার করতে শুরু করল।
অন্ধকার নেমেছে হাইওয়েতে। কে বুঝবে গাড়ি থামিয়ে কী হচ্ছে পিছনের সিটে!

৯

।। কেন মেঘ আসে।।

অনিমেষ চুপ করে বসেছিল।
ওসি এসে তাকে ডেকে পাঠালেন।
অনিমেষকে বসতে বলে বললেন, “বলুন”।
অনিমেষ বলল, “আমার স্ত্রী অফিস থেকে ফেরেন নি”।
ওসি বললেন, “মিসিং ডায়েরী করতে এসেছেন?”
অনিমেষ বলল, “হ্যাঁ”।
ওসি একটা প্যাড এগিয়ে দিয়ে বললেন, “এখানে আপনার স্ত্রীর নাম, আপনাদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ওর ফোন নাম্বার, ওর অফিসের ঠিকানা, অফিসের কলিগদের ঠিকানা, সব লিখুন। ছবি এনেছেন?”
অনিমেষ বলল, “ফোনে আছে”।
ওসি বললেন, “ঠিক আছে, আপনি মেইল করতে পারবেন? এই ইমেল অ্যাড্রেসে ওর ছবি মেইল করে দিন”।
অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।
ওসি বললেন, “সম্প্রতি ওর সঙ্গে কোন ব্যাপারে আপনার কোন রকম মতবিরোধ হয়েছে? ঝগড়া?”
অনিমেষ বলল, “না”।
ওসি বললেন, “ঠিক আছে। ঝগড়া হলে কে করেন? আপনি না আপনার স্ত্রী?”
অনিমেষ মাথা নিচু করল।
ওসি বললেন, “ইদানীং কোন স্ট্রেঞ্জ বিহেভিয়ার লক্ষ্য করেছিলেন?”
অনিমেষ বলল, “না”।
ওসি বললেন, “কাল সকালে আপনার বাড়ি যাব। বাড়িটাও দেখে আসা দরকার। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?”
অনিমেষ মাথা নাড়ল, “না, না, ঠিক আছে”।
ওসি গলা ছাড়লেন, “সামন্ত”।
একজন কনস্টেবল এল।
ওসি বললেন, “ওর থেকে যা যা ডিটেলস নেওয়ার নিয়ে মিসিং ডায়েরী লিখে নিন”।
অনিমেষ উঠল, “ধন্যবাদ”।
ওসি বললেন, “এর মধ্যে আপনার স্ত্রী ফিরে এলে আমাদের জানিয়ে দেবেন”।
অনিমেষ বলল, “ঠিক আছে”।
ওসির ঘরের বাইরে বেরিয়ে কন্সটেবলের কাছে সব বৃত্তান্ত দিয়ে থানা থেকে বেরোল অনিমেষ।
বাড়ি এসে দরজা খুলে মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে একবার পর্ণার ঘরে গেল সে। নাহ। ফেরে নি।
পিন্টো তার দিকে তাকিয়ে আছে।
অনিমেষ সোফায় বসে ঘরের আলো নিভিয়ে টিভি চালাল।

পিন্টোর নাক ডাকছে। অনিমেষের অস্বস্তি হচ্ছিল হঠাৎ করে।
ওসি জিজ্ঞেস করলেন স্ট্রেঞ্জ বিহেভিয়ারের কথা।
কাল অনেক রাত অবধি পর্ণা কার সঙ্গে কথা বলছিল। মাঝে মাঝেই বলছিল ক দিন ধরে। গলা নামিয়ে কথা বললেও সে যে কথা বলছে সেটা অনিমেষ বুঝতে পারছিল। জিজ্ঞেস করায় পর্ণা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, "তোমার কী? গোয়েন্দাগিরি করছো?"
অনিমেষ তাড়াতাড়ি সরে গেছিল। যার টাকায় খায়, তাকে প্রশ্ন করতে গেলে অনেক কিছু ভাবতে হয়। না ভেবে প্রশ্ন করা উচিত না। চিরকালই তার ব্যক্তিত্ব কম।
কিছুক্ষণ বসে অনিমেষ পর্ণার ঘরে গেল। পর্ণার আলমারি আলাদা, ব্যাগ আলাদা। সে জানে পর্ণার আলমারির চাবি কোথায় থাকে। পর্ণা জানে না, সে জানে বলে।
ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের একদম ভিতরে একটা ব্যাগের ভিতর পর্ণা চাবি রাখে।
অনিমেষ ব্যাগটা বের করে আলমারি খুলল।
হালকা পারফিউমের গন্ধ আলমারি জুড়ে।
আহ, কী সুন্দর। যেন পর্ণার গন্ধ লেগে আছে আলমারিতে।
অনিমেষ কয়েক সেকেন্ড বুঁদ হয়ে রইল। পর্ণার শাড়ি, সালওয়ারে ভর্তি আলমারি। কী মনে হতে লকার খুলল সে।
লকার খুলে ছিটকে গেল অনিমেষ। লকার ভর্তি দু হাজার টাকার বান্ডিল!
অনিমেষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।
কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি লকার বন্ধ করল সে। কত টাকা!
অথচ এই সেদিনও পর্ণার কাছে টাকা চাইতে গেলে খেঁকিয়ে উঠে পর্ণা বলেছিল, "টাকা নেই"।
এগুলো পর্ণারই টাকা তো? নাকি ব্যাঙ্কের টাকা?
আলমারি বন্ধ করতে গিয়ে পারল না সে। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে।
দু হাজার টাকার একটা বান্ডিল মানে দু লাখ টাকা। এখানে অন্তত চল্লিশ লাখ টাকা আছে। তার থেকে বেশিও হতে পারে। পর্ণার কাছে এত টাকা এল কোত্থেকে?
অনিমেষ আবার লকার খুলল।
বান্ডিলগুলো খাটের উপর রাখল।
একগাদা বান্ডিল আছে।
হিসেব করে দেখল পুরো বিয়াল্লিশ লাখ!
কাল সকালে পুলিশ আসবে। বাড়ি তল্লাশি করবে। এই টাকা পেলে নিশ্চয়ই টাকাগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেবে!
অনিমেষ একটা টাওয়েল নিল। টাকাগুলো সেই টাওয়ালে নিয়ে আলমারি বন্ধ করল।
ব্যাঙ্কও টাকাটার খোঁজ করতে পারে। অনিমেষের জোরে শ্বাস পড়তে লাগল। টাকার বান্ডিলগুলো একটা ব্যাগে ঢোকাল সে। এটা নিয়েই ঘুরতে হবে এবার।

১০

।। "সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা" ।।

গ্যাংস অফ ওয়াসেপুরে একটা ডায়লগ ছিল, "অ্যায়সে হি, সেক্সি লাগতা হ্যায়"।
রজত এই একটা কারণেই খুন করে।
ব্যাপারটা সেক্সি লাগে। জীবন বড়ই কষ্টকর এবং বোরিং।
দামি জিনিস কিনে, গাদা গাদা টাকা খরচ করে পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে বেড়ালেও একটা সময় সব কিছু স্বাদহীন হয়ে যায়।
ছিটকে আসা রক্তের স্বাদের সমান কিছু হতে পারে না। এ এক অদ্ভুত স্বাদ।
শরীর কাঁপিয়ে দেয়। ভাবনাদের এলোমেলো করে দেয়। প্রতিটা কোষ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় আহ!!!
ঠিক এই কারণেই তো বেঁচে আছি!
একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে বেঁচে থাকাটা ভীষণ ক্লিশে একটা ব্যাপার। সমালোচকদের ভাষায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা জীবন কাটিয়ে মরে যাওয়ার মত "ওভাররেটেড" বস্তু আর কিচ্ছু নেই।
নাহ...
কিচ্ছু না।
জীবন জী বাংলার থেকেও বোরিং।
বারে খুব হালকা মিউজিক বাজছে।
খুউউউউউউউব হালকা।
মেয়েটা গ্লাসটা নিয়ে অল্প অল্প করে চুমুক দিচ্ছে।
খানিকটা দূরে পুরু কাঁচের ওপাশে দেশ বিদেশ থেকে আসা প্লেন ল্যান্ড করছে। কোন কোনটা উড়ে যাচ্ছে।
সে তো এয়ারপোর্ট হতে চেয়েছে। একজনকে উড়িয়ে দেবে। আরেকজন এসে ল্যান্ড করবে।
আহ... ক্লিশে। ভীষণ ক্লিশে এবং ওভার রেটেড। বিরক্তিকর। তার লেভেলের লোকজনের এর থেকে অনেক অনেক বেশি কোন তুলনা ভাবা উচিত ছিল।
"আপনি কোথায় থাকেন?"
মেয়েটা প্রশ্ন করল।
রজত বলল, "পৃথিবীতেই"।
মেয়েটা হাসল, "ধুস, এটা বাজে। আচ্ছা ছাড়ুন। বলতে হবে না"।
মেয়েটার কি নেশা হচ্ছে?
নেশা জিনিসটা বড্ড ভাল। ধীরে ধীরে শরীর ছেয়ে যায়। চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। একটা তরল পানীয়র সঙ্গে রজতকে তখন লড়াই করতে হয়। কে জিতবে? পানীয় না সে?
মাঝে মাঝে নিজেকে পানীয়র চালিকাশক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়াও দরকার।
সিঙ্গল মল্ট দামী মদ। এখানে আরো দাম নিচ্ছে। মেয়েটা বলেছে বিল স্প্লিট হবে।
এয়ারপোর্টে সব কিছুই দামী।

এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট, আর কিছুই না।
পর্ণার বরের এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট যে একবারেই কম, রজতের বুঝতে সময় লাগে নি। এরকম মেনিমুখো পুরুষ থাকে। বউ পাশের ঘরে অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে থাকবে, এরা দরজা পাহারা দেবে।
রজত ভেবে দেখেছে এর পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। বউয়ের ওপর আর্থিক নির্ভরশীলতা। দুই, বর ধ্বজ। সে উত্থানহীন।
উত্থানে অক্ষম পুরুষ বড় কষ্টকর। তাদের দেখলে মায়া হয়, এদিকে তারা নিরাপত্তাহীনতা আর হিংসায় কখন যে ক্ষতি করে দিয়ে চলে যায় বোঝা যায় না।
অনিমেষ সম্পর্কে যতখানি জানার, রজত জেনেছে। বুঝেছে পর্ণা প্রতিটা মুহূর্ত আপসোস করে।
সম্পর্কে আপসোস করা মানুষকে ভাঙা তার কাছে জলভাত।
মদের থেকেও বেশি নেশা ধরাচ্ছে মেয়েটার পারফিউম।
কোন কোন পারফিউম চুম্বকের মত কাছে টানে। সব কিছু ভুলিয়ে দেয় অবলীলায়।
রজত পর্ণাকে ভুলতে শুরু করে দিয়েছে এর মধ্যেই। মনে রাখতে নেই।
রিসাইকেল বিন একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তু।
সরাসরি ডিলিট করাটা সব চেয়ে বেশি দরকার।
অ ন ন্যা।
মেয়েটার নাম।
শি লি গু ড়ি, তারপর সি কি ম।
পাহাড় তার শীত বা গ্রীষ্ম কখনো ভাল লাগে না। ভাল লাগে তখন, যখন খরস্রোতা নদী রাস্তায় উঠে আসে। পাহাড়ে ধ্বস নামতে শুরু হয়। ভয় কীসের? ভয় কেন থাকবে?
মরে তো যেতেই হবে একদিন।
জীবন যত কঠিন হবে, বেঁচে থাকা ততোই চ্যালেঞ্জিং।
অনন্যা নেশাতুর চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, “কী দারুণ লাগে না? আমার তো মনে হয় এয়ারপোর্টেই থেকে যাই”।
রজত বলল, “আমারও। কত এয়ারহোস্টেস!”
অনন্যা হেসে ফেলল, “এয়ারহোস্টেসদের নিয়ে বাঙালির একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে দেখেছি”।
রজত বলল, “শুধু বাঙালির না। সবারই”।
অনন্যা বলল, “আমার খুব ইচ্ছা ছিল। বাড়ি থেকে বারণ করে দিল। কনজারভেটিভ বড্ড”।
রজত গ্লাসে চুমুক দিল।
অতিরিক্ত দমন করে রাখা মেয়েরা খোলা জানলা আর বাতাস পেলে উড়তে বড্ড ভালবাসে।
দারুণ!

১১

।।"সবাই তো সুখী হতে চায়"।।

বিয়াল্লিশ লাখ টাকা নিয়ে সে কী করতে পারে? সে কি বড়লোক হয়ে গেল? পর্ণা কোনদিন তাকে এত টাকা দেয় নি। দিতোও না।
পর্ণা যদি কোনদিন না ফেরে, তাহলে এই টাকা তার হতে পারে। যার কাছে টাকা থাকে, সেই যদি না ফেরে, তখন ব্যাঙ্ক কী করে তার কাছে টাকা চাইতে যাবে? ফিরলে কোন দিন হবে না। পর্ণা ঠিক তার থেকে টাকাগুলো নিয়ে নেবে।
সে কী করবে? পালিয়ে যাবে? তা তো হয় না। সে নিজে গিয়ে পুলিশকে সব বলে দিয়েছে। এখন পালিয়ে গেলে পুলিশ সব ফেলে তাকে পাগলের মত খুঁজতে শুরু করবে।
খাটে শুয়ে পড়ল অনিমেষ। ভাবতে চেষ্টা করল।
সমস্যা হল সে বেশি ভাবতে পারে না। নিজের উপর কোন বিশ্বাসই আজকাল নেই তার। পর্ণার চাপে চাপে সে যে ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে, নিজেই বুঝতে পারে। আর হবে নাই বা কেন, ব্যাক্তিত্ব আসে টাকা থেকে। তার টাকা কোথায়? সব টাকাই তো পর্ণার। তাই ওই তাকে ডমিনেট করে। অনিমেষ উঠে বসল। এই টাকার জোরে সেও তো পর্ণাকে ডমিনেট করতে পারে। এমন জায়গায় টাকাটা লুকিয়ে রাখবে, পর্ণা কোনদিন খুঁজে পাবে না। পাগলের মত করবে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে আর সে বোকার মত বসে থাকবে।
অনিমেষ চোখ বুজল বসে থেকেই। শরীরে উত্তেজনা হচ্ছে। এরকম উত্তেজনা বহুদিন হয় না। পর্ণা তাকে ক্লীব বানিয়ে দিয়েছিল। এখন যেন তার পৌরুষকে সে অনুভব করতে পারছে।
এই টাকা নিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। ওই পাড়াতেও তো জানা যায়। বেশি দূর না। গেলে কেমন হয়? ভোরের দিকে ফিরে আসবে?
কলেজ লাইফে একবার ঘুরতে ঘুরতে গেছিল। টাকা ছিল না বলে খেদিয়ে দিয়েছিল ওখানকার লোকজন। এখনি যাবে সে।
তার খাটের তলা থেকে ব্যাগটা বের করল সে।
একটা বান্ডিল থেকে বেশ কয়েকটা দু হাজার টাকার নোট বের করল।
ঘরের দরজা বন্ধ করে স্কুটিতে উঠল।
রাস্তায় আবার সেই পুলিশের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখামাত্র চিনল।
অনিমেষকে বলল, "কোন খবর পেলেন?"
অনিমেষ মুখ ম্লান করার অভিনয় করল, "নাহ। থানাতেই যেতে হবে"।
পুলিশটি বলল, "ঠিক আছে। যান যান"।
অনিমেষ বেরিয়ে গেল। থানা পেরোল, আরো খানিকটা রাস্তা গিয়ে সেই পাড়ার কাছে এসে স্কুটি দাঁড় করালো।
খানিক দূরে বেশ কয়েকটা মেয়ে রংচঙে ছোট ছোট পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে আওয়াজ দিল একজন, "যাবি নাকি?"

অনিমেষ গলা খাকড়ানি দিল, “রেট?”
মেয়েটা বলল, “সাতশো”।
অনিমেষ মেয়েটাকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চলল।
মেয়েটা চিৎকার করল, “সাড়ে ছ’শো দিস। শোন না”।
অনিমেষ মনে মনে হাসল। মেয়েটা ভেবেছে তার টাকা নেই।
হাহ! বউয়ের টাকায় এ পাড়ায় এসেছে সে। যে জিনিসটা বউ তাকে চাইলেও দেয় না, সেটাই নেবে সে। দাম বাড়া। ওরে মাগীগুলো, দাম বাড়া। তোরা কী ভাবছিস? অনিমেষের টাকা নেই? শালা গাণ্ডুগুলো! মানুষ হবে না কোনদিন।
অদ্ভুত রোশনাই, অদ্ভুত সব লোক। শহরের ভেতরে আরেকটা শহর। অনিমেষ প্রাণ ভরে দেখতে লাগল।
কোন দিন এখানে আসবে সে ভাবেই নি। পকেটে টাকা আসতেই চলে এল। হয়ত ভিতরে ভিতরে অনেক দিন ধরেই আসতে চেয়েছে। পারে নি। আজ পারল।
একটা মেয়ে নাভি বের করা টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ মেয়েটার সামনে গিয়ে বলল, ”কত?”
মেয়েটা বলল, “পনেরোশো। যাবি?”
অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। এই টাকাটা ঠিক আছে। আরেকটু বেশি হলেও চলত, তবু ঠিক আছে। মেয়েটাকে দেখলে অনেকদিন শান্ত হয়ে থাকা অঙ্গটা জাগছেও বেশ। সে বলল, ”চল”।
মেয়েটা তাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। ছোট ঘুপচি ঘর। তেল চিটচিটে গন্ধ।
অনিমেষ বলল, ”তোর নাম কী?”
মেয়েটা খেঁকিয়ে উঠল, ”নাম জেনে কী করবি বাল? যা করার কর, এই তুই এডভান্স কর শালা”।
অনিমেষ বুক পকেট থেকে একটা দু হাজার টাকার নোট বের করে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা বলল, ”পাঁচশো কোথায় পাবো এখন?”
অনিমেষ বলল, ”রেখে দে। তোকে দিলাম”।
মেয়েটা খুশি হয়ে বলল, ”আইব্বাস। তুই তো দিলখোলা রে। বল কী করতে হবে”।
অনিমেষ মেয়েটাকে জাপটে ধরে বুকে চুমু খেতে খেতে বলল, ”সব। সব করবি, স অ অ অ ব। বউ যা করে, তাই কর”।

১২

।। “বসন্ত এসে গেছে” ।।

“আপনি কখনো ওসব পাড়ায় গেছেন?”
অনন্যার নেশা হচ্ছে বুঝতে পারল রজত। সে কিছু না বোঝার ভান করে বলল, ”কোন সব পাড়া?”
অনন্যা ফিক ফিক করে হাসতে লাগল, ”আপনি তো দেবদূত দেখছি, বুঝতে পারছেন না? সত্যি? নাকি ইয়ার্কি মারছেন”?
রজত জানে এই সময় তাস দেখাতে নেই। না জানার ভান করে থাকতে হয়।
সে মাথা নাড়ল, “না না ইয়ার্কি মারছি না সত্যি বলছি। ওসব পাড়া বলতে?”
অনন্যা তার কাছে এগিয়ে এল, ”প্রস্টিটিউটদের পাড়া। বুঝলেন এবার?”
অনন্যার শরীরের সুগন্ধ এসে পৌঁছল রজতের কাছে। মদের গন্ধ মিশ্রিত সুগন্ধ। এর চেয়ে ভালো পৃথিবীতে আর কিছু হয় না। রজত কল্পনা করতে শুরু করল, অনন্যার শরীর তছনছ করছে সে।
মুখে ভালোমানুষী বজায় রেখে বলল, ”ওরে বাবা, ওসব কোনদিন ভাবতেই পারি নি, বাবা যা কড়া ছিল! মেরে তক্তা বানিয়ে দিত”!
অনন্যা বলল, ”আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। দেখার ইচ্ছা ছিল। এ জন্মে আর যাওয়া হল না। ওদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে, কত কষ্ট বলুন?”
রজত বলল, ”সিরিয়াসলি, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীর সব মেয়েকে মলেস্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতাম”।
কথাটা বলে মনে মনে খুব হাসল রজত। এই কথাটা মেয়েরা হেব্বি খায়। যে সব ছেলে নারীবাদী, সেসব ছেলে আসলে ফাঁদ পেতে রাখে মেয়েদের জন্য। এসব কথা শুনে মেয়েগুলো গলে যায়। ভাবে ”আহা রে, ছেলেটা আমাদের জন্য কত ভাবে”!
আসলে কিচ্ছু ভাবে না। কথার জাল বুনে একটা বড় ফাঁদ তৈরি করা হয়।
এরা বুঝতে পারে না কখন সে ফাঁদে ধরা পড়ে যায়। নারীবাদী পুরুষ আছে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায়। লম্বা লম্বা হ্যাজ নামায়। আসলে এগুলো সব ফাঁদ। মেয়ে ধরার ফাঁদ।
অনন্যা তার দিকে চোখ ছোট ছোট করে বলল, ”আর ইউ ফেমিনিস্ট?”
রজত বলল, “সেভাবে ভেবে দেখি নি কোনদিন। তবে আমি আমার মাকে খুব ভালবাসি”।
আহ! তার প্রিয় পিক আপ লাইন। মায়ের সেন্টুর তেলে লোকজন ভীষণ গড়াগড়ি খেতে ভালোবাসে।
অনন্যা বলল, “আমিও। আমার মাকে আমি ভীষণ মিস করি যখন বাইরে থাকি। মায়ের থাকা না থাকার উপর কত কিছু ডিপেন্ড করে! বাড়ি গেলে কিচ্ছুটি করতে না দিয়ে দিয়ে অভ্যাস খারাপ করে দেবে। তারপরে যখন আমি ফিরে যাই, সব কাজ নিজেকে করতে হয়, তখন চোখ ফেটে চল আসে। মনে হয় মা প্লিজ আমার কাছে এসে থাকো”।
তিন পেগেই মা চলে এসেছে। রজত অনন্যার হাত ধরল, ”সত্যিই। থাক ভেবো না বেশি, ইমোশনাল হয়ে যাবে। ওহ, আমি তুমি বলে ফেললাম”।
অনন্যা হাত ছাড়িয়ে নিল না। বলল, ”থাক। তুমিটাই থাক। আমি তুমিই বলি। বলছি অনেক মদ খেয়ে

ফেলেছি, আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি কিন্তু। আমার অভ্যাস খুব খারাপ। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ি"।
রজত বলল, "বেশ তো। আমি আছি। ঠিক ডেকে দেব। চল"।
রজতই বিল দিল। এগুলোকে সে ছোট ছোট ইনভেস্টমেন্ট বলে মনে করে। তার আসল শখ মেটানোর জন্য আদর্শ লগ্নি। অনন্যা উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। রজত হেসে অনন্যাকে তুলল। অনন্যা তার শরীরের উপর গোটা শরীর ছেড়ে দিল।
রজত অনন্যার কোমর ধরল। অনন্যা আপত্তি করল না। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে অনন্যাকে নিয়ে আগের চেয়ারে বসাল। অনন্যা জড়ানো গলায় বলল, "আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তোমার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমাই?"
রজত বলল, "শিওর। এটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে?"
অনন্যা রজতের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাল।
রজত অনন্যাকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।
উত্তেজনা আসছে শরীরে, প্রবল উত্তেজনা।
তার শরীরে মেয়েটা লেগে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।
আহ... এক রাত্তিরে দু দুটো শিকার?
রজত চোখ বন্ধ করল। এবার নিজের সঙ্গে কিছু কথোপকথনের পালা...

১৩

।। "তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল" ।।

অনন্যা কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে উঠে বসে বলল, "এভাবে ঘুম হয় না। ধুস"।
রজত বলল, "আপাতত বসে বসেই ঘুমোতে হবে"।
অনন্য নেশাতুর গলায় বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক"।
রজত অনন্যার হাত ধরল। অনন্যা ফিসফিস করে বলল, "তুমি খুব ফাস্ট"।
রজত অনন্যাকে বসিয়ে ওর পাশে বসে বলল, "বিছানায় আবার ঠিক উলটো। তোমার স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না"।
অনন্যা বলল, "সত্যি?"
রজত বলল, "একদম। তিন সত্যি দেব"?
অনন্যা হাসতে হাসতে বলল, "ডুয়ারসের কোন এক বন বাংলোয় তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে"।
রজত নিজের মনে হাসল। হায় রে মেয়ে, নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছিস! বলল, "কাল সকালেই কোথাও একটা যাওয়া যাক। যাবে?"
অনন্যা বলল, "কেন নয়? আমি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে। আমার যেখানে ইচ্ছে হবে আমি যাবো। তোমার সঙ্গে যাব"।
রজত বুঝল মেয়েটার প্রচুর নেশা হয়ে গেছে। সে বলল, "তুমি এখন আমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে পড়। কালকের ব্যাপার, কাল দেখা যাবে"।
অনন্যা বলল, "উফ, সো রোম্যান্টিক তুমি। এতদিন কোথায় ছিলে? পথ ভুলে তুমি কি এলে?"
রজত বলল, "কিশোর কুমার। ভাল ভাল। শোও এবার"।
অনন্যা রজতের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে কাঁধে মাথা রেখে শুল।
এয়ারপোর্টের বাকিরা তাদের আড়চোখে একবার দেখে নিল।
রজত মনে মনে হেসে নিল।
শিকার এভাবেই আসে। তার পাতা ফাঁদে পা দেয়।
ঘুম আসে না শুধু। জেগে বসে থাকতে হয়। রাত জেগে রজত বসে থাকে। স্নায়ু উত্তেজিত হতে শুরু করে। রক্ত ছিটকে আসার দৃশ্য ভিডিও করে রেখে বার বার দেখে সে। মরতে মরতে মেয়েগুলো যখন শেষ মুহূর্তেও ভাবে আসলে কিছুই হবে না, সেই আশাটা দেখলে হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়।
মানুষের সত্যিই আশার শেষ নেই।
এরা রাজনীতিকদের থেকে ভাল শাসনের আশা করে, সাপের থেকে নৈতিকতা আশা করে।
তারপরে হাতের কাছে থাকা সব থেকে নিরীহ সাপটাকে মেরে ভাবে কী দিলাম। এ দেশের নাগরিকরা সবাই বাবুরাম সাপুড়েকে ডাকতে চায় শেষতক।
নাহ, অনন্যা আজকের শিকার হবে না।
হুট করে না, খেলিয়ে মারাতেই বেশি আনন্দ পাওয়া যায়...

১৪

।।“ভাগ ডিকে বোস”।।

ওসি অরুণাক্ষ বসু চুপ করে বসে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সেকেন্ড অফিসারের সঙ্গে অল্টারনেটিভ ডে তে রাতে একবার করে থানায় আসেন তিনি। এখনো বিয়ে থা করেন নি। খেয়াল খুশিমত চলাফেরা করেন।
অনিমেষ বেরিয়ে যাওয়ার পরে অরুণাক্ষ একবার ভাবলেন অফিস কোয়ার্টারে ফিরে যাবেন। কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে কনস্টেবল বরুণ বর্মণকে ডেকে পাঠালেন। বরুণ খইনি ডলছিল। ডাক শুনে সেটা লুকিয়ে অরুণাক্ষর সামনে এল।
অরুণাক্ষ বললেন, “কী হাল এখন? কোন খবর দিচ্ছেন না আপনি? রতন ফিরেছে বস্তিতে?”
রতন এলাকার পুরনো গুণ্ডা। একটা কেসে গা ঢাকা দিয়েছে। উপরমহল থেকে চাপ আছে রতনকে গ্রেফতার করার। বিভিন্ন খোঁজ খবর দেওয়ার লোকজনের সঙ্গে বরুণের ভাল আলাপ। অরুণাক্ষ তাই বরুণের কাছেই খোঁজ নিলেন।
বরুণ বলল, “স্যার, রতনের খোঁজ এখন পাবেন না। পালিয়েছে মানে মাস তিনেক আর এলাকায় দেখবেন বলে মনে হয় না”।
অরুণাক্ষ বললেন, “তা বলে চুপ করে বসে থাকলে হবে? হেড অফিস তো ফোন করে করে মাথা খেয়ে নেয়। এর পর ফোন করলে আপনাকে ধরিয়ে দেব। উপরে আপনি জবাব দেবেন”।
বরুণ দাঁত বের করল, “কী যে বলেন স্যার, আমি কী করে জবাব দেব? আমি কি ইংরেজি বলতে পারি নাকি?”
অরুণাক্ষ বললেন, “ইংরেজি বলতে হবে না। আপনি আপনার ভাষায় জানাবেন। কোচবিহার কবে যাবেন?”
বরুণ বলল, “যাব না এখন। বউ এখানে চলে এসেছে”।
অরুণাক্ষ বললেন, “তাহলে তো আপনার পৌষমাস। ভালই আছেন”।
বরুণ বলল, “কী যে বলেন স্যার, আমাদের বয়সে আবার পৌষমাস! এখন কিচ্ছু নেই জীবনে। আপনি বিয়ে করলে বুঝতেন। এখন আনন্দ পাবেন। পরে দেখবেন কিছুই নেই। সব মায়া”।
অরুণাক্ষ হাসতে হাসতে বললেন, “দরকার নেই মশাই বিয়ে করার। কী দরকার?”
বরুণ বলল, “না করলেও হবে না স্যার। সব কিছুরই দরকার আছে জীবনে। বুড়ো বয়সে একা একা মরবেন নাকি?”
অরুণাক্ষ বললেন, “একা মরাই ভাল। মরার সময় তো সঙ্গে কেউ যাবে না! তাহলে আর একা দোকা হিসেব করে কী হবে?”
বরুণের ফোন বাজছিল।
বরুণ ফোন দেখে বলল, “স্যার, রবিন ফোন করেছে। টিপার”।
অরুণাক্ষ বললেন, “ধরুন”।
বরুণ ফোনে কথা বলে ফোন রেখে বলল, “রতন ঢুকেছে স্যার। এই মাত্র। যাবেন?”
অরুণাক্ষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, ”যারা যারা আছে, সবাইকে নিয়ে নিন। চলুন, চলুন”।
কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ জনের দল নিয়ে রতনের বস্তিতে বাহিনী নিয়ে হানা দিলেন অরুণাক্ষ। বস্তির এ ঘর সে ঘর ঘুরে রতনের ঘরের সামনে অরুণাক্ষকে নিয়ে গেল বরুণ। দরজায় তালা দেওয়া। অরুণাক্ষ হতাশ

চোখে বরুণের দিকে তাকাল। বরুণ রবিনকে ফোন করে গালাগালি শুরু করল। কয়েক মিনিট গালাগাল খাবার পর রবিন জানাল রতন “খারাপ” পাড়ায় গেছে”।
বরুণ বলল, “তুই থাকবি। দেখিয়ে দিবি। নইলে তোকে এবার জেলে ঢুকিয়ে দেব দেখবি”।
রবিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “ঠিক আছে স্যার”।
বাহিনী আবার গাড়ি নিয়ে বেরোল।
পাড়ার মোড়ে রবিন এবার দাঁড়িয়ে ছিল। থানার লোকজন দেখে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা ভয় পেল না।
কয়েকটা দালাল পালাল শুধু। রবিন দূরত্ব রেখে হাঁটতে শুরু করল। বরুণ চাপা গলায় অরুণাক্ষকে বলল, “ওকে ফলো করতে হবে। চলুন”।
তারা হাঁটতে শুরু করল।
রবিন একটা ঘুপচি ঘর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।
অরুণাক্ষ দরজা নক করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা মেয়ে গালাগালি দিতে দিতে দরজা খুলল। রতন ল্যাংটো হয়ে খাটেই শুয়ে ছিল।
পুলিশ দেখে পালাতে গেল।
অরুণাক্ষ এগিয়ে গিয়ে এক লাথি মারলেন রতনের পায়ে। রতন পড়ে গেল।
বাহিনীর বাকিরা রতনকে জামা কাপড় পরিয়ে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করল।
অরুণাক্ষ সিগারেট খাচ্ছিলেন। দেখতেও পেলেন না অনিমেষ তাকে দেখা মাত্র অন্য গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

#
“স্টেটের সব ক’টা থানাতে মিসিং ডায়েরী চেক করতে বলে দিয়েছি। দেখা যাক, কিছু আসে নাকি”। সিগারেট ধরিয়ে এস পি বললেন।
কৌশিক বলল, “প্রেস ছিঁড়ে খাবে খবরটা ব্রেক হবার পর”।
এস পি বললেন, “ছিঁড়ে খেলে খাবে। কী করার আছে? এখানে আমাদের কি কিছু করার ছিল নাকি?”
কৌশিক বলল, “তা ঠিক। আমাদের কিছু করার ছিল না”।
এস পি বললেন, ”থানায় বসে মদ খেতে পারতাম আর লরি আটকে ঘুষ খেতে পারতাম। তাই না?”
কৌশিক বলল, “স্যার আপনি রেগে যাচ্ছেন”।
এস পি বললেন, “রাগছি না। ফ্যাক্ট জানতে চাইছি। এই রাতে গাড়িগুলো থেকে কেমন কালেকশন হয়?”
কৌশিক বলল, “আমি ঘুষ খাই না”।
এস পি বললেন, “বেশ তো, আটকানোর চেষ্টা করেছো? আমাকে রিপোর্ট করেছো কারো নামে? যারা ঘুষ খায় তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেছো?”
কৌশিক চুপ করে গেল। এস পি বললেন, “চাকরি শুরু করেই এসব করতে শুরু করে দিয়েছ। কর্তব্যরত অবস্থায় মাতাল হয়ে থাকা খুব গর্বের ব্যাপার?”
কৌশিক বলল, “কী করব স্যার? এখানে সময় কাটানোর জন্য কিছু তো করতে হবে। নাইট ডিউটি ছিল, এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ডিউটি করি। একা একা কী করব? আমাদের দিকটা দেখবেন না?”
এস পি বললেন, “কী দেখতে হবে তোমার দিকটা? এখানে তাহলে তোমাকে ডিউটি দেব না বলছ? কোথায় ডিউটি করবে তুমি বল। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব”।
কৌশিক চুপ করে গেল। এস পি বেশ রেগে গেছেন বুঝতে পারল সে। এস পি বললেন, “তোমাদের বয়স কম, তাই তোমাদের বকাবকি করি। সিস্টেমে থেকে সিস্টেমটা পাল্টানোর চেষ্টা কর। না পারার কিছু নেই।

হাতি ঘোড়া কী আছে? এই ঘুষের চক্করে কতগুলো সাসপেক্টেড ক্রিমিনাল হাত থেকে বেরিয়ে যায়, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট? কত কত ক্রিমিনাল? কত বাঁচাবো তোমাদের আর?"
কৌশিক বলল, "বাঁচাতে হবে না স্যার। আমার এলাকা থেকে কোন সাসপেক্টেড ক্রিমিনাল ঘুষ দিয়ে পালাতে পারবে না, এ গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিতে পারি"।
এস পি বললেন, "বেশ, শুনে ভাল লাগল। এবার বল, আমরা কী করব? কী করা উচিত আমাদের?"
কৌশিক বলল, "স্যার বডি আইডেন্টিফিকেশন হলে আমাদের কাজটা সোজা হয়ে যেত। ভিক্টিমকে কেন মেরে ফেলে গেছে, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না"।
এস পি সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, "ফরেনসিকের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। এভাবে যে মাল কাউকে খুন করতে পারে, সে একটা সাইকো কেস। এরকম সাইকো বাজারে ঘুরে বেড়াবে, সেটা হতে দেওয়া যাবে না। সবাইকে অ্যালার্ট করার প্রয়োজন আছে। আমি তো এই লাশটাকে দেখে আমার চেনা মানুষদেরই ইমাজিন করে যাচ্ছি। হাউ টেরিবল। এভাবে কেউ মেরে পুড়িয়ে দেয়?"
কৌশিক বলল, "স্যার রাস্তায় ক্যামেরার ফ্রিকোয়েন্সি আরো বাড়ানো দরকার বলে আমার মনে হয়"।
এস পি রাস্তা থেকে নেমে মাঠের দিকে হাঁটতে লাগলেন। টর্চ হাতে কৌশিক এস পির পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ক্ষেত শুরু হয়েছে। এস পি বললেন, "টর্চ ফেলো। দেখো এদিকে কিছু ফেলেছে নাকি?"
কৌশিক ক্ষেতের দিকে টর্চ ফেলল। কিছু দেখা গেল না।
এস পির ফোন বাজছিল। কথা বলে ফোন রেখে বললেন, "বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত টোটাল সতেরোটা মিসিং ডায়েরী ফাইল হয়েছে স্টেটে। আটটা মহিলা। শর্টলিস্টিং এর কাজ শুরু করতে সুবিধা হত ফরেনসিকের হেল্প পেলে"।
কৌশিক বলল, "রাত দশটার পরে ক'টা মিসিং ডায়েরী হয়েছে স্যার?"
এস পি বললেন, "জিজ্ঞেস করি নি। আরেকবার ফোন করতে হবে"।
ফোন নিয়ে এগিয়ে গেলেন এস পি। কৌশিক বড় রাস্তায় উঠল।
রাতের রাজপথে পুলিশের গাড়ি দেখে লরিগুলো ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে।
কৌশিক চিন্তিত মুখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।
ঠিকই। এই খুনিটা সাইকো। একে খোলা বাজারে ছেড়ে রাখা ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে...

১৫

।। "হৃদয়ে আমার কী যে ব্যথা, তুমি তো সে কথা জানো না" ।।

অনন্যাকে শীলভদ্র আগেই দেখেছিল। রণিতার ভয়ে কিছু বলতে পারে নি। কখনো কখনো চেনা মানুষকেও না চেনার মত করে দেখতে হয়। অনন্যা একটা ছেলের কাঁধে মাথা দিয়ে বসে আছে। ছেলেটা অত্যন্ত সুপুরুষ। এরকম ছেলে হবার স্বপ্ন শীলভদ্র দেখত ছোটবেলায়। সব মেয়ে তার জন্য পাগল হয়ে যাবে। পরিবর্তে একটা আতা ক্যালানে তৈরি হল। অনন্যাকে প্রপোজ করতে না পারার ফ্রাস্ট্রেশনে রণিতাকে বিয়ে করে ফেলল। বিয়ে করা মানে কী? বিয়ে করা মানে হল একটা কোন দিন শেষ না হওয়া টানেলে ঢুকে পড়া। যেতে যেতে মাঝে মাঝে অন্ধকারে ঠোকর খাবে, উল্টে পড়বে, আরো কত কত কিছু হতে পারে। তবু টানেল থেকে বেরোনোর কোন উপায় থাকবে না।

এখন তো বউ পাশেই আছে। তবু অনন্যাকে একা বসে থাকতে দেখে মাথাতেও আসে নি অনন্যার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আসা দরকার। মনে হল বন্যেরা বনে সুন্দর। অনন্যা একা।

ছেলেটা কখন এল। কথা বলল। তুলে নিল।

সে কোনদিন এরকম হতে পারবে না।

শীলভদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জীবনটা ঝাঁটের। ঝাঁট মানে বাংলা ডিকশনারিতে কি কোন শব্দ আছে? নেই মনে হয়। আরবান ডিকশনারি বলে একটা জিনিস আছে। ঝাঁট জিনিসটা ওই আরবান ডিকশনারিতে জায়গা পেতে পারে।

"তুমি গাড়ি বুক করেছো তো?" রণিতার কথা শুনে শীলভদ্রের হুঁশ ফিরল। সে বলল, "হ্যাঁ, করেছি তো। কেন বল তো?"

রণিতা বলল, "এয়ারপোর্টে নেমে আমার দরাদরি পোষায় না। তুমি তো জীবনেও এসব পারো না, সেই আমাকেই করতে হবে। সব সময় ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না"।

শীলভদ্রর বলা উচিত ছিল, "রিয়েলি?" বলতে পারল না। বলা যায় না।

একজন বিবাহিত পুরুষ সব সময় তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না। পারলে সে ফোর নাইন্টিএইট এ খেয়ে যাবে। ফোর নাইন্টিএইট শব্দটা পুরুষ সমাজের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ। সব বউ ব্যাপারটাকে অত্যাচারিত হবার পরে ব্যবহার করে না। কেউ কেউ বরের বারোটা বাজানোর জন্যও ব্যবহার করে।

বিয়ের দু বছর হয়েছে। বাচ্চা হয় নি তাদের। বাড়ি থেকে মা ক্রমাগত ঝাঁট জ্বালিয়ে যাচ্ছে। শীলভদ্র মাকে বলেছে দেখছে। শীলভদ্রকে রণিতা বলেছে এখন "ফাক অফ"।

বাচ্চা নেওয়ার কথা বললে রণিতা রেগে যায় দেখে শীলভদ্র আজকাল এ নিয়ে রণিতাকে ঘাঁটায় না। রণিতার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে নাকি। দূর থেকে অনন্যার ফিগারের সঙ্গে রণিতার ফিগারের মনে মনে তুলনা করে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। এই ফিগার খারাপ হলে কী আর এমন খারাপ হবে? এই তো ফিগার! তার নাকি আবার ভাল খারাপ। কিন্তু এ তো আর বলা সম্ভব না। অগত্যা চুপ করে থাকাই ভাল।

রাত বাড়ছে। শীলভদ্রর ঘুম পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে রণিতাকে এখানে ফেলে রেখে চলে গেলে হত। যেখানে খুশি পালিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্ট সবথেকে ভাল মাধ্যম। সমস্যা হল যত ইচ্ছে করুক, চলে যাওয়া যায় না। কত রকম ঝামেলা থাকে জীবনে। শিকড় গজিয়ে যায়। বাবা মা আছে। রণিতা ওদের জেলের ভাত খাইয়ে দেবে। তাছাড়া তারও তো বাবা মার কাছে ফিরতে ইচ্ছে করতে পারে। ডিভোর্স জিনিসটা অতো

সোজা না যে চাইলেই পাওয়া যেতে পারে। আজীবন রণিতাকে সহ্য করতে হবে। রণিতার রাগ সহ্য করতে হবে। বদরাগ, জঘন্য ব্যবহার সহ্য করে যেতে হবে।

ছেলেটা আর অনন্যাকে খুশি দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওদের বিয়ে হয় নি। বিয়ে না হলে পার্টনার চেঞ্জ করা যায়। অনন্যা পার্টনার চেঞ্জ করে? কিন্তু এক কালে অনন্যাকে ম্যারেজ মেটিরিয়াল মনে হত। এখন সে কি লিভ ইন মেটিরিয়াল হয়ে গেছে?

শীলভদ্র আবার শ্বাস ছাড়ল। সে বাস মিস করে গেছে। অনন্যার এসি বাস মিস করে সে অফিস টাইমের রণিতা বনগাঁ লোকালে উঠেছে। পদে পদে হোঁচট। গালাগাল। ধাক্কাধাক্কি। এ জীবনটা তাকে সহ্য করে যেতে হবে।

উঠল সে চেয়ার ছেড়ে। রণিতা জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

শীলভদ্র বলল, "কী আবার হবে? বাথরুম যাব"।

রনিতা বলল, "এভাবে বলছ কেন? ভাল করে কথা বল। কথা বলতে ভুলে গেছো নাকি?"

শীলভদ্র গুটিয়ে গেল। রণিতা বকলে গুটিয়ে যেতে হয়। সে বলল, "আমি ওভাবে বলি নি। বস। আসছি"।

রণিতা "হু" বলল বেশ রেগে।

শীলভদ্র বাথরুমে গেল। এখন হাতের কাজ করার দরকার ছিল। করা সম্ভব না। পাবলিক টয়লেটে এসব পারে না সে। অনন্যাকে ভেবে কত সময় কাটিয়ে দেওয়া যেত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাথরুম করল সে। পাশ ফিরতে দেখল অনন্যার সঙ্গে থাকা ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে।

শীলভদ্র ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখল। ছেলেটা সুপুরুষ। যে কোন মেয়ে এরকম ছেলের জন্য ডাইভ দেবে। শরীরে টাকার গন্ধ পাওয়া যায়।

শীলভদ্র এয়ারপোর্টে এলে বুঝতে পারে, কিছু কিছু পোশাক তাদের আর বড়লোকদের পার্থক্য করে দেয়। এই ছেলেটা এমন জামা কাপড় পরেছে, দেখলেই বোঝা যায় টাকা আছে। অনন্যা কেন যাবে না? কী আছে তার কাছে? সে একটা বাল। পিওর বাল।

শীলভদ্র বেসিনে হাত ধুয়ে পিছন ফিরে আরেকবার ছেলেটাকে দেখল। ছেলেটা ঈষৎ মত্ত। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেচ্ছাপ বেরোচ্ছে না। এত সময় নিচ্ছে কেন? প্রস্টেট প্রব্লেম আছে নাকি? অদ্ভুত! শীলভদ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

১৬

।। "এই একলা ঘর" ।।

ফ্ল্যাটে ফিরে অনিমেষ শ্বাস ছাড়ল। কীভাবে ফিরেছে সেই জানে। খারাপ পাড়ায় পুলিশ ওভাবে রেইড করতে পারে, সে বুঝতে পারে নি। ভাগ্যিস চলে এসেছিল।
মাথা খাটাবার চেষ্টা করল সে। টাকাগুলো কার? পর্ণার? এতগুলো টাকা নিয়ে পর্ণা ঠিক কী করতে চাইছে? লুকিয়েই বা রেখেছে কেন? নাকি অফিসের টাকা চুরি করেছে?
অনিমেষ খাটের উপর টাকাগুলো মেলে রাখল। আহ...
কী অসাধারণ দৃশ্য।
নোট বাতিল করার সময় দেশের নেতাদের প্রোপাগান্ডা ছিল, এর ফলে কালো টাকা নষ্ট হবে। তা যে কত বড় ঢপ, তা যত দিন গেছে, জলের মত পরিষ্কার হয়েছে। টাকার কোন সাদা কালো হয় না। ওটা যার কাছে থাকে, তার হয়ে যায়। এখন যেমন অনিমেষের হয়েছে। এই টাকাগুলো নিয়ে সে কী কী করতে পারে? অনেক কিছু পারে।
অ নে এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ ক কিছু।
কিন্তু পর্ণা ফিরলে কী হবে? তার নামে চুরির কেস দিয়ে দেবে? এত বছর ওর ঘাড় ভেঙে খেয়েছে সে। কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত তার। কিন্তু ওসব কিছু আসছে না। মনে হচ্ছে টাকাগুলো নিয়ে কোথাও চলে যেতে হবে। অনিমেষ চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বাথরুমে গিয়ে কমোডে বসে রইল।
পিন্টো চিৎকার করতে শুরু করেছে আবার। মহা বিরক্তিকর কুকুর একটা। কলিং বেল বাজল। গুটিয়ে গেল অনিমেষ।
যাহ! পর্ণা? চলে এল? ওর কাছে আবার ঘরের চাবিও থাকে।
সে তাড়াতাড়ি কমোড থেকে বেরিয়ে টাকাগুলো ব্যাগে রাখল। না। কেউ ঘরে এসে ঢোকে নি। তারমানে পর্ণা না।
অনিমেষ দরজা খুলল। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক শুকিয়ে গেল। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে সে বলল, "বলুন"।
অরুণাক্ষ তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "টহলে বেরিয়েছিলাম, আপনার কথা মনে পড়ল, চলে এলাম। ম্যাডাম ফিরেছেন?"
অনিমেষ মাথা নাড়ল, "না। এখনও ফেরে নি ও"।
অরুণাক্ষ বললেন, "আসতে পারি?"
অনিমেষ বলল, "নিশ্চয়ই। আসুন"।
অরুণাক্ষ ড্রইং রুমে ঢুকে পিন্টোকে কিছুক্ষণ আদর করে সোফায় বসে ঘরের চারদিকে দেখে বললেন, "আপনি কী করেন?"
অনিমেষ বলল, "সে অর্থে কিছু না"।
অরুণাক্ষ বললেন, "আপনার স্ত্রীই সংসার চালান?"
অনিমেষ মাথা নাড়ল। হৃদযন্ত্র বড়ই গড়বড় করছে আজ। ধুক পুক, ধুক পুক করে চলেছে। এরকম করা উচিত না। নিজেকে অনিমেষ বলল "শান্ত হও। শান্ত হও। আজ অবধি কিচ্ছু ছিঁড়তে পারো নি। আজ

তোমাকে শান্ত হতে হবে। তোমার বউকে খোঁজার দায়িত্ব পুলিশের। তারা যা বোঝার বুঝবে। তুমি কেন অশান্ত হয়ে উঠছ? শান্ত হও"।

অরুণাক্ষ সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। একজন কনস্টেবল দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণাক্ষ তাকে বললেন, "ভেতরে এসে বস। কথা বলে যাই। যেখানে যেখানে খবর পাঠানোর পাঠিয়ে দি"। তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে অরুণাক্ষ বললেন, "এ কুকুর কত নিয়েছিল?"

অনিমেষ বলল, "পনেরো"।

অরুণাক্ষ বললেন, "হাজার না শো?"

অনিমেষ বলল, "পনেরো শো তে আজকাল কুকুরের বাচ্চা পাওয়া যায় না"।

অরুণাক্ষ বললেন, "তা ঠিক। মেইন্টেনেন্স চার্জও বেশি। অনেক ঝামেলা কুকুর পোষার। আচ্ছা, যাই হোক, ম্যাডামের সঙ্গে আপনার শেষ ঝগড়া কবে হয়েছে?"

অনিমেষের মনে পড়ে গেল সে চুপ করে খাটে বসে আছে আর পর্ণা তাকে ঝেড়ে যাচ্ছে, "অকর্মার ধাড়ি হয়েছ একটা। কী দেখে যে বিয়ে করেছিলাম তোমায়! স্পাইনলেস ক্রিচার। জঘন্য"। সে খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "আমাদের ঝগড়া হত না। আমি ঝাড় খেতাম। ও ঝাড় দিত'।

অরুণাক্ষ হাসলেন, "সেই। আপনি চাকরি করেন না। ডিভোর্স দেবার কথা বলতেন নাকি উনি?"

অনিমেষ বলল, "বার দুয়েক বলেছিল"।

অরুণাক্ষ বললেন, "কোথাও চলে যেতে পারেন তো এখন? এরকম নাও হতে পারে নিখোঁজ হয়েছে। ছেড়ে চলে গেছেন, পরে আপনাকে জানাবেন"।

অনিমেষ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "হতে পারে"।

অরুণাক্ষ বললেন, "সেরকম কোন খবর হলে আমাকে জানাবেন"।

অনিমেষ মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।

অরুণাক্ষ বললেন, "আপনার টেনশন হচ্ছে?"

অনিমেষ বলল, "হচ্ছে"।

অরুণাক্ষ বললেন, "টেনশন কমাতে কী করেন আপনি?"

অনিমেষ বলল, "কিছু করি না। ঘুম আসে না শুধু"।

অরুণাক্ষ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আজকালকার দিনে চাকরি পাওয়াও খুব কঠিন কাজ। আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, কী করবেন?"

অনিমেষ বুঝতে পারছিল সে অপমানিত হচ্ছে। তীব্র অপমানিত। যদিও আজকাল এসব বড় গা সওয়া হয়ে গেছে। সে বলল, "কিছু একটা করতে হবে। দরকার হলে ভিক্ষা করতে হবে"।

অরুণাক্ষ বললেন, "ভিক্ষা করবেন?"

অনিমেষ বলল, "এছাড়া আর কীই বা করতে পারি?"

অরুণাক্ষ হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিকই। কোন খবর হলে জানাচ্ছি। আসি"।

যেভাবে হঠাৎ করে এসেছিলেন, সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন অরুণাক্ষ। অনিমেষ দরজা বন্ধ করে দুবার চেক করে নিল।

অফিসার সন্দেহ করছে পর্ণা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেলে কার সঙ্গে যাবে? অফিসের কেউ? যদি পালিয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই এই টাকাটার খোঁজে আবার ফিরবে। তাহলে তার কি করা উচিত? পর্ণা ফিরে আসার আগে টাকাগুলো নিজে পালিয়ে যাওয়া? নাকি পুরো টাকাটাই কোথাও সরিয়ে দেওয়া? কোথায় সরানো যায়?

অনিমেষ ভাবতে বসল। একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যাগটা নিয়ে বসার ঘরের সোফার তলায় রাখল সে। এই ঘরেই থাকা যাক আপাতত। আর কোথাও যেতে হবে না।

১৭

।। “যখন সময় থমকে দাঁড়ায়” ।।

“স্যার। কোন খবর এল?”
এস পি সাউ সিগারেট খাচ্ছিলেন।
রাস্তা চিরে একটার পর একটা ট্রাক চলে যাচ্ছে। কৌশিকের প্রশ্ন শুনে বললেন, “না। আর বাই দ্য ওয়ে, তুমি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমার কোন নেটওয়ার্ক নেই?”
কৌশিক বলল, “আমি কোন খবর না পেয়েই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি স্যার”।
সাউ বললেন, “আর সেটা কি কি নিয়ে?”
কৌশিক বলল, “আশে পাশের থানার মিসিং রিপোর্টে সেরকম কিছু নেই স্যার”।
সাউ বললেন, “তুমি এত মাতাল কবে থেকে হলে কৌশিক?”
কৌশিক বলল, “মাতাল না স্যার। বোর হচ্ছিলাম বলে খাচ্ছিলাম। কি করব এখানে? কিছুই তো করার নেই”।
সাউ বললেন, “করার অনেক কিছুই আছে। এই কেসটাই দেখো। এরকম কেস কালেভদ্রে আসে। হুট হাট তো আসে না। এরকম কেস সলভ করতে পারলে আর কী চাই? তোমার কী দরকার বল তো? কিক দরকার, নাকি এই ট্রাকের কালেকশন হলেই তুমি খুশি”?
কৌশিক বলল, “আমার ওসব ট্রাকের টাকা লাগে না স্যার। খোঁজ নিলেই জানতে পারতেন। আর কিকের কথা বলছেন? যেভাবে কলকাতা থেকে এখানে নজিরবিহীনভাবে পোস্টিংটা চেঞ্জ করা হল, সেটা অ্যাকচুয়ালি আমায় কোন কিক দিয়েছে নাকি জানি না, তবে আমার পেছনে যে কিকটা মেরেছে, তার ব্যথা এখনও যায় নি”।
সাউ বললেন, “তো? পানিশমেন্ট পোস্টিং হয়েছে বলে রাগ? এরকম পোস্টিং আমাদেরও হয়। তা বলে কি ঘরে বসে যেতে হবে?”
কৌশিক কিছু বলল না। সরে গেল। বিরক্ত লাগছিল। জ্ঞান দিতে পারলে সিনিয়ররা আর কিছু চায় না।
হাঁটতে হাঁটতে সে রাস্তা দিয়ে নামল। সত্যজিৎ ফোন করছে। ধরল সে, “বল”।
সত্যজিৎ বলল, “কী রে ভাই, কী খবর? ঝাঁটটা আছে এখন?”
কৌশিক বলল, “আছে তো। জ্বালিয়ে খেল মাইরি”।
সত্যজিৎ খিক খিক করে হেসে বলল, “আর কী ভাই। কপাল। অসুর নামে একটা সিরিজ দেখেছিলাম, সেই কেস দেখছি। কীভাবে পুড়িয়েছে। এ উদ্ধার করা চাপ আছে। ডি এন এ টেস্ট করাতে হবে”।
কৌশিক বলল, “যা পারিস কর। পুরো নেশাটা নামিয়ে দিল। গিয়ে ঘুমোতে পারলে ভাল হত”।
সত্যজিৎ বলল, “তুই ঘুমো। তোর আর কী আছে? এস পি খুনিকে ঠিক বের করে নেবে”।
কৌশিক বলল, “উঁহু। হাইওয়ের ধারে খুন হয়েছে। সেটা হয়েছে দিল্লি রোডে। খুনি দুটো জিনিস করতে পারে। এক, কলকাতার দিকে যেতে পারে। দুই, দিল্লির দিকে গেছে”।
সত্যজিৎ বলল, “আরেকটা জিনিস হতে পারে। সেটা হল খুনি কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে এদিকের কোন লোকালিটিতে”।
কৌশিক বলল, “না। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে মাল এখানে নেই। ফেলে চলে গেছে”।

সত্যজিৎ বলল, “কেন মনে হচ্ছে সেটা?”
কৌশিক বলল, “জানি না। তবে হচ্ছে”।
সত্যজিৎ বলল, “আমি দেখছি কিছু করা যায় নাকি। দরকার হলে দিল্লির ফরেন্সিক টিমকেও ডাকতে হতে পারে। পলিটিকাল মার্ডার না তো?”
কৌশিক বলল, “আমি কিচ্ছু জানি না। আমি কী করে জানব? তবে লোকাল কেউ নিখোঁজ নেই, কোন রিপোর্টও নেই”।
সত্যজিৎ বলল, “দু বছর আগে একটা কেস হয়েছিল আসানসোল দুর্গাপুর এলাকায়। এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল ছিল। যেদিন থেকে মেয়েটা ম্যানেজারকে হুমকি দিতে শুরু করল, ম্যানেজার মেয়েটাকে প্রথমে মারল, তারপর কেটে ফেটে স্যুটকেসে বডি নিয়ে দামোদরে ফেলে দিল। এই কেসটা সেরকম এক্সট্রা ম্যারিটাল থেকেও হতে পারে”।
কৌশিক বিরক্ত গলায় বলল, “একটু আগে বমি করেছি। এসব বলা বন্ধ কর তো। সব সময় এসব বীভৎস রস আমার ভাল্লাগে না”।
সত্যজিৎ বলল, “তাহলে চাকরি ছেড়ে লিটল ম্যাগ মেলায় পদ্য পড়তে যা বাল। এগুলো যদি না ফেস করতে হয়, তাহলে চাকরি করছিস কী ছিঁড়তে”?
কৌশিক রেগে মেগে ফোন কেটে দিল। পায়ে একটা কিছু লাগল। ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে নিচু হল সে। একটা লাইটার। হলদে রঙের লাইটার।

১৮

।। "তুমি ছিলে শুধু রঙ করা পুতুল" ।।

টাকা নাকি সব কিছু কিনতে পারে না।
সব থেকে বাজে কথা।
টাকা সব কিনতে পারে।
সব থেকে বেশি কিনতে পারে মান সম্মান।
যত বার বাড়িতে পেপারের বিল এসেছে, যতবার তাকে পর্ণার কাছে সেটার জন্য হাত পাততে হয়েছে, ততবার শুনতে হয়েছে, "একটা সামান্য পেপারের বিলও দিতে পারো না। ডিজগাস্টিং"।
টাকার দাম কোন দিন কমে না। যাদের টাকা থাকে না, তারাই ফ্রাস্ট্রেশনে টাকাকে ছোট করার চেষ্টা করে। টাকার প্রয়োজন আছে। মারাত্মক প্রয়োজন আছে। হাতের কাছে টাকার ব্যাগটা নিয়ে বার বার নোটগুলোয় হাত দিয়ে দেখছে রজত। ভাল লাগছে। শান্তি লাগছে। চিন্তাও লাগছে।
পর্ণা ফিরে আসবে? নাহ। আসবে না। আসবে না। চুলোয় যাক।
ফোন বাজছে তার। থানার ফোন। ধরল সে।
"হ্যালো"।
"অনিমেষবাবু। আমি বলছি"।
অনিমেষ বুঝল ওসির গলা। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল সে, "বলুন"।
"বলছি আপনার ওয়াইফের ফোনের লাস্ট লোকেশন অফিসেরই আছে। তারপর থেকে সে ফোনের আর কোন ট্রেস নেই"।
অনিমেষ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে এখন কি ও অফিসে আছে? আমি কিন্তু অফিসে কাউকে পাই নি"।
"জানি তো। হতে পারে উনি অফিসে ফোন রেখে চলে গেছেন"।
অনিমেষ থমকাল কয়েক সেকেন্ড। বলল, "ঠিক আছে। আপনাকে ধন্যবাদ"।
"না না। এখানে ধন্যবাদের কিছু নেই। আমি জাস্ট ফোন ট্রেস করালাম, রেজাল্টটা আপনাকে জানালাম। এর মধ্যে উনি ফিরে এলে আপনিও আমাকে জানাবেন কি হল। ওকে?"
"নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ"।
"ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম"।
ফোন কেটে গেল। ওসি লোকটা ভাল। সব পুলিশ খারাপ হয় না। কেউ কেউ অত্যন্ত ভদ্রলোক হয়। এই লোকটা তাদের দলে পড়ে। ভাবছে পর্ণা ফেরে নি বলে অনিমেষ চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, তাই সব আপডেট দিচ্ছে। ওসি জানেই না, পর্ণা না ফিরলেই সে খুশি হয়। এই টাকা দিয়ে নতুন জীবন শুরু করা যায়। পিন্টো মেঝেতে নাক ঘষে শুয়ে আছে।
অনিমেষের খিদে পেল। রান্না ঘর থেকে বিস্কুট নিয়ে এসে সে একটা বিস্কুট পিন্টোকে দিল, নিজে একটা খেল।
চোখ বন্ধ করে খারাপ পাড়ার মেয়েটার কথা মনে করল। মুখটা ঘেন্নায় বিকৃত হল। পোষায় না। এরা ময়লা। পৌরুষ দিয়ে জয় করতে হয় তো কোন কুমারীকে। কোন অপূর্ব সুন্দরীকে।

টাকা দিয়ে কী হবে? কিচ্ছু হবে না। সমস্যা হল, সব ওই টাকার কাছেই নত হয়ে যায়। শেষ কথা বলে টাকা। কিছুতেই একে হারানো যায় না। যতবারই তাড়াতে চেষ্টা করা যাক না কেন, ঘুরে ফিরে সেই টাকাই আসবে। বাকিদের আর কাজ কী? সেই দূরে দাঁড়িয়ে হাসবে। অনিমেষের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। সে উঠে পর্ণার ড্রেসিং টেবিলের ছোট ড্রয়ার খুলল। পর্ণার একটা ফোন আছে এখানে। দুদিন আগেই পর্ণা নতুন ফোন কিনেছে। পুরনোটা ড্রয়ারে রেখেছে। সে দেখে রেখেছিল। নতুন ফোন এলে পুরনো ফোনের ঠিকানা এখানে হয়।

ফোনটা অন করতে গিয়ে অনিমেষ দেখল চার্জ নেই। চার্জে বসাল সে। টাকা থাকলে সব কিছু কেনা যায়। মাসে একটা করে নতুন ফোনও। কত দামী দামী ফোন কিনত পর্ণা। আর সে? কী প্যাডওয়ালা পুরনো মডেলের ফোন ইউজ করে। নেহাত ভাত খাওয়াত বলে টিকে গেল সে। নইলে কবে পালিয়ে যেত!

ফোন অন হয়েছে। পাস কোড চাইছে। এটা জানে অনিমেষ। ১৯৮৯। পর্ণার জন্মসাল। তাকে না বললেও আড়চোখে ঠিকই খেয়াল করেছিল সে। গ্যালারিতে কত কত ফটো। সব সেলফি। অফিসের ছেলেদের সঙ্গে ছবি।

অনিমেষ থাকতেও কত ছেলের সঙ্গে ছবি তুলত! সব ঠেকিয়ে! কোন ব্যাপারই না যেন!

রেগে মেগে গ্যালারি বন্ধ করে দিল অনিমেষ। কোন লাভ নেই। এসব দেখে কী করবে? সেও করবে। পর্ণারই টাকায় রোজ নতুন কোন মেয়ের সঙ্গে শোবে। কী বলছিল ওসি? পর্ণা পালিয়ে যেতে পারে? কতদিন পালিয়ে থাকবে? তার সঙ্গে একদিন যোগাযোগ ওকে করতেই হবে? ও যদি ভেবে থাকে অনিমেষ এই টাকার খোঁজ পাবে না, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করবে। হোয়াটস অ্যাপ খুলছে না। অন্য ফোনে চলে গেছে।

ফোনের ইনবক্স খুলল সে।

ও বাওয়া! কী নাম?

জানু? শালা! এই জানুটা কে আবার? অনিমেষের কপাল দপ দপ করছিল। জানুর সঙ্গেই কোথাও আছে তার মানে এখন। নিজের ফোন থেকে এই জানুর নাম্বার ডায়াল করল সে। রিং হচ্ছে। ধরল।

ও প্রান্তে এক পুরুষ কণ্ঠ, “হ্যালো”।

“পর্ণার হাজব্যান্ড বলছি। ও এখন তোর সঙ্গে আছে? এই খানকির ছেলে। তুই কোথায় রে?”

ও প্রান্তে কিছুটা নীরবতা। পরক্ষণে ফোন কেটে গেল।

অনিমেষ তুমুল রেগে গিয়ে খিস্তি মারল, “শুয়োরের বাচ্চা। আজ তোরই একদিন কী আমার একদিন”।

আবার ফোন করল নাম্বারটায়। ফোন অফ বলছে। সে উঠে দাঁড়াল। এই ছেলেটা পর্ণার জানু?

কী করা যায়? পৌরুষ জাগছে তার। পেলে কুকুরের মত খুন করবে মালটাকে। কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

১৯

।। “পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি” ।।

এখনও পিঠের ব্যথাটা ফিরে ফিরে আসে। ছোটকা খুঁজে পেয়েছিল তাদের চিলেকোঠার ঘরে। অথচ সেদিন ছোটকার থাকার কথাই ছিল না। চিলেকোঠায় আসা তো দূরের কথা। কী করে যেন চলে এল। সে চোখটা যতবার মনে পড়ে, পিঠের ব্যথাটা ফিরে ফিরে আসে রজতের। সম্পূর্ণ নগ্ন কাকীমা কাকুকে বোঝাতে চাইছে কত কিছু, কাকু পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে বাঁশের কঞ্চিটা পড়ে ছিল। তাই দিয়েই তাকে মেরে যাচ্ছে। ব্যথাটা কমে নি আজও।

রজত বুঝতে পারে ফোনটা বন্ধ করার দরকার ছিল। পর্ণার ভেড়াটার তো তার নাম্বার পাবার কথা না। মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছিল পর্ণা। তাহলে তার নাম্বার পেল কী করে ভেড়াটা? রজতের অস্থির লাগছিল। সে উঠে দাঁড়াল। অনন্যা ঘোর লাগা গলায় বলল, “কোথায় যাচ্ছ?”

রজত বলল, “আসছি। এখনই আসছি”।

বাথরুমে ছুটল রজত। ফোন থেকে সিমটা বের করে কমোডে দিয়ে ফ্ল্যাশ করে দিল। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিজেকে দেখতে হয় এই সময়টা। নিজেকে বোঝাতে হয়, টেনশন করার কিছু নেই। মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে। টেনশন করার কিছু নেই।

কিচ্ছু নেই।

“এক্সকিউজ মি। আপনি কি কোন প্রব্লেমে পড়েছেন?”

গলাটা শুনে ফিরে তাকাল রজত। এই লোকটাকে সে আগেও বাথরুমে দেখেছে। কে এ মালটা? সে বলল, “না, ইটস ওকে”।

লোকটা কেমন যেন থত মত খেল তার কথা শুনে। রজত আশ্বস্ত হল। মালটা গাণ্ডু টাইপ। কোন ক্ষমতা নেই। টিপিকাল বাঙালি টুরিস্ট। আলগা পিরীত করে এই টাইপের লোক কোথাও বেড়াতে গেলে। দার্জিলিং ম্যাল হোক, পুরীর সি বিচ হোক, ইন্ডিয়া গেট হোক, যেখানেই এই ধরণের লোকের সঙ্গে দেখা হবে, এরা দাঁত ক্যালাবে। কত সস্তায় হোটেল পেয়েছে শোনাবে। এদের কোমরে একটা ব্যাগ থাকবে। সেখানে মানিব্যাগ। কুল দেখানোর জন্য এদের গেঞ্জিতে সানগ্লাস গোঁজা থাকবে। গলায় সোনার হার। কখনো রূপোর। হাতে আংটি। কোনমতে হোটেলে ঢুকে বিকেলে সস্তা মদ খেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত চালিয়ে সংস্কৃতিবান হবার নাটক করবে।

লোকটা বেসিনে গিয়ে অকারণ জল নষ্ট করল। রজত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে অনন্যার পাশে বসল। এখনই মাথা খারাপ হবার কিছু নেই। আর কিছুক্ষণ পরেই ফ্লাইট। কারো বাবার ক্ষমতা নেই তার গায়ে হাত দেওয়ার।

“আমার না কাজ করতে ভাল লাগে না, জানো”।

অনুযোগের গলায় কথাটা বলল অনন্যা।

রজত অনন্যার হাত ধরল। যতটা সম্ভব, অনন্যা তার গা ঘেঁষে এসে বসেছে। অনন্যা বলল, “আমার শুধু ঘুরতে ইচ্ছে করে। কত কত জায়গায় ঘোরার ছিল। কিচ্ছু হল না। শুধু কাজ আর কাজ। ভাল লাগে না। একদম ভাল লাগে না”।

রজতের পিঠের ব্যথাটা ফিরে আসছে কেন? বাথরুমের লোকটা দূরে এক মহিলার পাশে গিয়ে বসল। কেমন ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রজত বলল, "আমার এখন অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। নর্থ বেঙ্গল আর না। মনে হচ্ছে ধুস, ওসব না করে মুম্বই চলে যাই। কিছুক্ষণ পর দেখছি মুম্বইয়ের একটা ফ্লাইট আছে"।
অনন্যা বলল, "মুম্বই? নট ব্যাড। পালিয়ে যাবে? তারপর?"
রজত হেসে অনন্যাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করল, "তারপর কোথাও একটা হারিয়ে যাবো। যাবে?"
অনন্যা ফিসফিস করে বলল, "এক ডেসটিনেশনের জন্য বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া? হাউ রোম্যান্টিক! কী হবে? দুদিন পরে জয়েন করব না হয়! সিকিমে জানিয়ে দেব! কোন প্রব্লেম নেই। গেলেই হয়। এখন টিকেট কাটা যাবে?"
রজত বলল, "আমি দেখব?"
অনন্যা রজতের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "প্লিজ। ওয়ান ডে ভ্যাকেশন উইথ আ হ্যান্ডসাম স্ট্রেঞ্জার! সো রোম্যান্টিক। যাব। কত টাকা লাগবে? ইউ ক্যান টেক মাই কার্ড!"
রজত বলল, "আমার কাছে টাকা আছে। তোমার একটা আইডি দাও। আমি দেখছি"।
অনন্যা ব্যাগ খুঁজতে শুরু করল। রজত চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লোকটাকে ওর বউ খুব ঝাড়ছে। কীসব বলছে। এখান থেকেই রজত দেখতে পেল লোকটা কেমন চিমসে মেরে গেছে। তার পিঠের ব্যথা কমতে শুরু করছে।
মুম্বই!
মায়ানগরী। একটা ইতিহাসও তো আছে এই শহরে। পূরবীর সঙ্গে জুহু বিচেই দেখা হয়েছিল তার। পূরবী মাথুর। বলিউডের হিরোইন হতে এসেছিল। আঠেরোয় পা দিয়েছে সবে। রজত তখন বিয়াল্লিশ। একটা লং ড্রাইভে পুনে। রাস্তার ধারের জঙ্গলে হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তুমুল সেক্স এবং তারপর তার সফল অপারেশন।
মুম্বই পুনে এক্সপ্রেসওয়ে! রজত টিকেট পাল্টাতে ছুটল দুজনের।

২০

।। “ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে” ।।

এস পি সাহেব চলে গেলেন আরেকটু রাত বাড়তে। হাইওয়েতে গাড়ির সংখ্যা সামান্য কমেছে। রাস্তার পাশে জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনাস্থল তল্লাশি শেষ হয়েছে।
কৌশিক জিপের পেছনের সিটে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। কুড়িয়ে পাওয়া লাইটারটা এস পি সাহেবকে দিতে গিয়েও দিল না। সিগারেট ধরাল সেটা দিয়েই।
কনস্টেবল সিধু বেরা একটা নতুন বোতল নিয়ে এসে বলল, “স্যার পুরো নেশাটাই চলে গেল, কী বলেন?”
কৌশিক বলল, “আর কী! মিক্স কর”।
সিধু জলের বোতলে মিশিয়ে দিল। কৌশিক অনেকটা খেয়ে নিল একবারে। সিধু বলল, “কী বাজেভাবে পুড়িয়েছে স্যার। নাকি অজ্ঞান করে পুড়িয়েছে? কে জানে”।
কৌশিক বিরক্ত মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “এসব কথা বলতে হবে না এখন। বাদ দাও”।
সিধু বলল, “বাদ দিয়ে কী লাভ স্যার? গোটা রাতটাই নষ্ট করে দিল হারামিটা। কেমন শুয়োরের বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে লোকজন। কত কিছু হতে পারে! আজকাল তো কীসব বলে অনার কিলিং না কী যেন আছে, সেসবও হচ্ছে এখানে। কে জানে, কী কেস”।
কৌশিক বলল, “আহ। থামো না। এসব কথা বলা বন্ধ কর। বলছি তো সমস্যা হচ্ছে”।
সিধু বলল, “কী নিয়ে বলব স্যার? সোনাগাছি নিয়ে? আগের হপ্তাতে বিলাস গেছিল। ডাকবো? শুনবেন?”
কৌশিক বলল, “বিলাস গেছিল কেন?”
সিধু বলল, “ওর শালা এসছিল। জামাইবাবু শালায় মিলে মাঝরাতে মদ খেতে খেতে প্ল্যান করে চলে গেল। কী করবে স্যার, এটাই এঞ্জয়”।
কৌশিক বলল, “আর ওর বউ কিছু বলল না”?
সিধু বলল, “না স্যার। জানলে তো বলবে। এই বিলাস, এদিকে আয়”।
সিধু চিৎকার করে বিলাসকে ডাকল। বিলাস কাছে এসে দাঁড়ালে সিধু বলল, “স্যারকে বল, সোনাগাছিতে কী করলি”।
বিলাস রেগে গেল, “ধোর, এসব কথা বলে নাকি স্যারের কাছে?”
সিধু বলল, “আরে বাল বল। অনেক নাটক মারিয়েছিস। বল শালা”।
বিলাস চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, “স্যার, শালা জামাইবাবু মিলে গেছিলাম আর কী। আমি তো চিনতাম না। শালা নিয়ে গেল। ওই যে শোভাবাজার আছে, ওখান থেকে কাছেই। কেমন বিলা জায়গা স্যার। কত রকম লোক। এমন কতজন দেখলাম যাদের কখনো ভাবাই যায় না যে এরাও যায়। আমি তো ভাবতাম শুধু আমাদের মত বদমালগুলোই যায়। তার পর আর কী বলব”। সিধু লজ্জিত মুখে কৌশিকের দিকে তাকাল।
কৌশিক বোতল থেকে অনেকটা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, “ভাল হয়েছে। যা করেছো করেছো। বেশ করেছো।”।
সিধু আগ্রহী গলায় বলল, “কত নিল সেটা বল ভাই”।

বিলাস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কৌশিকের ফোন বেজে উঠল। কৌশিক দেখল এস পি ফোন করছেন। সে বলল, "এই তোমরা চুপ কর। ফোন এসছে। চুপ চুপ"।
বিলাস গাড়ির কাছ থেকেই দূরে চলে গেল। কৌশিক ফোন ধরল, "হ্যাঁ স্যার"।
এস পি বললেন, "কৌশিক, কলকাতার দিকে রাত দশটার পর আজ রাতে তিনটে মিসিং রিপোর্ট আছে। তার মধ্যে দুজন ছেলে, একজন মেয়ে বা স্ত্রী। শোভাবাজারে বাড়ি। তার হাসব্যান্ড মিসিং ডায়েরী করেছেন। ছবি পাঠাচ্ছি। তোমাদের এলাকায় কোন দিন দেখেছো নাকি দেখো। ইনি হয়ত হলেও হতে পারে। ডি এন এ ম্যাচ করা সম্ভব হলে কনফার্ম হওয়া যাবে"।
কৌশিক বলল, "ওকে স্যার"।
ফোন রেখে সে হোয়াটস অ্যাপ খুলল।
মেয়েটার ছবি দেখে তার নেশাটা আরেকবার নষ্ট হল।
এই মেয়েটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে? লাইটারটা তার হাতেই আছে। কৌশিক মন দিয়ে লাইটারের দিকে দেখল। সে খুব ভাল করে জানে, এটায় কোন ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যাবে না। রাস্তার ধারের দোকান থেকে কেনা নতুন লাইটার। যেন আগুন লাগিয়ে ফেলে দেবার জন্যই কেনা হয়েছিল। যে কাজটা করেছে, সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার একজন খুনি। যা করেছে, প্ল্যান করে করেছে।
আর কী অদ্ভুত সমাপতন! একটু আগেই বিলাস বলছিল শোভাবাজার থেকে সোনাগাছি গেছে। আর এ মেয়েটা শোভাবাজারের! অদ্ভুত!
কৌশিক কয়েক সেকেন্ড ছবিটার দিকে তাকিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবার?

২১

।। "ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা" ।।

ছোটকা সুইসাইড করেছিল। দরজা বন্ধ ছিল। খুলছে না দেখে সবাই ছুটে গিয়ে দেখেছিল বডিটা ফ্যান থেকে ঝুলছে। একটা কাগজে লিখে দিয়ে গেছিল, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়"।

ছোটকাকী তার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল। তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেও বাড়ির কেউই সন্দেহ করে নি।

ছোটকাকে পুড়িয়ে আসার পরে বাবা, মা, জ্যাঠা, জ্যেঠির সে কী কান্না! রজত বাড়িতে এসে ছোটকাকীর ঘরে গিয়ে দেখেছিল ছোটকাকী চুপ করে বসে আছে। তাকে দেখে বলল, "আমি কী করব এবার? ও বাড়ি চলে যাব?"

রজত তখন ষোল। ছোটকাকীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না।

ছোটকাকী কোথাও গেল না। তাদের বাড়িতেই থেকে গেল। সাদা শাড়ি পরে থাকত। খিদেটা কমল না। বেড়ে গেল। রজত পারত না। চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে ছোট কাকী তার শরীর জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করলেই সে ছোটকাকে দেখতে পেত। যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। তার কিছুতেই উত্থান হত না। ছোটকাকী তাকে চড় মারত। গালাগাল করত। কোন লাভ হত না। শেষমেশ তাকে ফেলে রেখে চলে যেত।

রজত পালাতে শুরু করল দুপুরগুলো। গঙ্গার তীর, সিনেমা হল, পার্ক, ভরা দুপুরে সে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। ছোটকাকীর থেকে না, ছোটকার থেকে না, আদতে নিজের থেকে।

পিঠের ব্যথাটা ছোটকাকে পুড়িয়ে আসার পরেও ছিল। যায় নি। কোন দিনই যাবে না হয়ত।

মা, জ্যেঠি অনেকবারই ছোটকাকীর কাছে জানতে চেয়েছে। ছোটকাকী প্রত্যেকবারই বলেছে কিছুই জানত না। হয়ত অফিসে কোন সমস্যা। অসাধারণ অভিনেত্রী ভদ্রমহিলা। ওরকম হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

দুদিন পর ছোটকাকী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। বিয়ে করল।

রজত একদিন ছোটকাকীর নতুন ফ্ল্যাটে গেল। কত গয়না দেখাল তাকে ছোটকাকী। বিয়েতে পেয়েছে। ওর বরের পরিবারসূত্রে পাওয়া গাদা গাদা সোনার তাল। ও ফ্ল্যাটে নতুন বর আর ছোটকাকীর আলাদা সংসার। কেউ থাকে না।

ছোটকাকীর নতুন বরও ছিল না। গয়না দেখাতে দেখাতেই শাড়ি খুলতে শুরু করল ছোটকাকী। শুরুটাও ভালোই হয়েছিল। তারপরেই তার তীব্র ঘেন্না হল। নিজের উপর। ছোটকাকীর উপর। গোটা পৃথিবীর উপর। তীব্র রমণ পরিণত হল তীব্র হিংসায়। খাটের পাশে একটা হাতুড়ি পেয়ে গেছিল সে। তীব্র আঘাত করেছিল মাথায়। চিৎকার করার আগে মুখ চেপে ধরেছিল ছোটকাকীর। যতক্ষণ শ্বাস ছিল, ততক্ষণ মেরে গেছিল সে। লাশটা দেখে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্নান করল। বাইরের ঘরে ফেলা জামা কাপড় পরে, সব গয়নাগাটি নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। কেউ ভাবতেই পারে নি সে খুন করতে পারে। বাড়ির লোক যখন জানতে পেরেছিল, সে তখন উচ্চ মাধ্যমিকের পড়া পড়তে ব্যস্ত। কত আলোচনা, কত উদ্বেগ!

চিলেকোঠার ঘরেই গয়নাগুলো রেখেছিল সে। কত গয়না!

কেউ কল্পনাও করতে পারে নি রজতের কাছে অতো কিছু থাকতে পারে!

#

"চল। চেক ইন করে ফেলা যাক"।

অনন্যার কাছে এসে হাসল রজত। অনন্যা তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল। রজত অনন্যাকে উঠতে সাহায্য করল। তার হাত জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনন্যা বলল, "ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! জানি না এ জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। কিন্তু আজকের রাতটা আমি কোন দিন ভুলব না"।
অনন্যা লাগেজ জমা দিল চেক ইন কাউন্টারে। সিকিউরিটি হতে একবারেই সময় লাগল না। আঠেরো নাম্বার টার্মিনালে যেতে বলা হয়েছে। বোর্ডিং পাশ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনন্যা বলল, "আশা করি তোমার কোন সমস্যা করলাম না"।
রজত হাসল, "সমস্যা? লুক অ্যাট ইয়োরসেলফ। তোমাকেই তো এতদিন স্বপ্নে দেখতাম আমি"!
অনন্যা হেসে গড়িয়ে পড়ল, "খুব বড় বড় কথা বলছ যে! এখানেই সুহাগ রাত করার ইচ্ছে আছে বুঝি?"
রজত অনন্যার কোমর জড়িয়ে ধরল, "লেটস ওয়েট সুইটহার্ট। মুম্বই ইজ ওয়েটিং ফর আস"।
অনন্যা বলল, "নট অনলি মুম্বই মিস্টার হ্যান্ডসাম। বিয়ের পর আমরা এই পৃথিবীর সব হানিমুন ডেসটিনেশনে যাবো। এমন একটা জীবন হোক আমাদের, যে জীবনের স্বপ্নই শুধু মানুষ দেখতে পারে। হবে না?"
রজত অনন্যার কোমরে আলতো চাপ দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই হবে"।
প্রথম প্রথম নারী শরীর স্পর্শ করলে রজতের অস্বস্তি হত। যত দিন গেছে, সে তত পারদর্শী হয়ে উঠেছে। সে শিখেছে ঠিক কোন জায়গাটা ছুঁলে মেয়েরা পাগল হয়ে যায়। ঠিক কোন কথাটা বললে... তবে অনন্যা তার ছকের বাইরের মেয়ে। তার ছকের মেয়েদের সংসার থাকে। ব্যস্ত স্বামী থাকে যে সময় দিতে পারে না। অনন্যা তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে। দেখুক। পূরবীও দেখেছিল। অনন্যার সুন্দর গলাটা দুভাগ হবে ব্লেডের আঘাতে, ফরসা শরীর থেকে রক্ত ছিটকে এসে লাগবে তার চোখে মুখে, চোখ উপড়ে আসবে তীব্র আতঙ্কে, সুন্দর স্তনদ্বয় নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকবে মৃত্যুর পরে... আহ... রজতের উত্তেজনা বাড়তে শুরু করল। অনন্যা জড়িয়ে আছে তাকে।
কেউ দেখছে না। এসব জায়গায় সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।
টার্মিনালের কাছে এসে বসল তারা। কিছুক্ষণ পরেই বোর্ডিং শুরু হবে। কাঁচের বাইরে দেখল সে। কত প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য গন্তব্য।
এখনও কত জায়গায় যেতে হবে তাকে!

২২

।। "আমরা সবাই রাজা" ।।

একদিন পর্ণা কাকে যেন ফোন করে বলেছিল, খুব রাগ হলে জোরে জোরে শ্বাস নিতে ছাড়তে হয়। এতে স্ট্রেস রিলিজ হয়, রাগও কমে।

অনেক দিন পরে অনিমেষের একটা ঠিক ঠাক রাগ হয়েছিল। ভেবেছিল পর্ণার শেখানো পথেই রাগ কমাবে। সমস্যা হল, সেটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না সে। টাকার ব্যাগটা জ্বালাতে শুরু করল। মাথা চুলকে নাম্বারটায় আর বার দুয়েক ফোন পেয়ে সুইচড অফ শোনার পর চেষ্টাটা ছেড়ে দিল।

প্ল্যান করতে হবে একটা, যাতে পর্ণা আসার আগেই সে টাকাটা নিয়ে পালাতে পারে। পিন্টো তার দিকে পিট পিটে চোখে তাকিয়ে আছে। অনিমেষ পিন্টোর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?"

পিন্টো করুণ চোখে তার দিকে তাকাল। এভাবে তাকালে কীভাবে কাউকে ফেলে রেখে যাওয়া যায়? সোনাগাছির মেয়েটা বলেছিল অনেকদিন পর একটা মরদের মত মরদ দেখল সে। পর্ণাও একদিন বলবে। বলতে বাধ্য হবে। তাকে শক্ত হতে হবে। বাড়িতে এলে সবার আগে পর্ণাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সে। বার বার জিজ্ঞেস করবে এই জানুটা কে। দরকার হলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। কিন্তু টাকা ফেরত দেবে না। এটাই একটা অজুহাত পাওয়া গেছে। "যা তুই বেশ্যা মেয়ে, আমার সঙ্গে বিয়ে করে যার তার সঙ্গে গিয়ে শো, কিন্তু তোর টাকা আমি ফেরত দেবো না"।

ভোর চারটে বাজল। বিড় বিড় করে বলতে বলতে পায়চারি করতে শুরু করল অনিমেষ।

ফোন বাজছে। আবার থানা থেকে। ধরল সে। "হ্যাঁ, বলুন"।

"আমি অরুণাক্ষ বলছি অনিমেষ বাবু"।

"হ্যাঁ বলুন"।

"আপনাকে একটা খবর দেওয়ার আছে"।

"হ্যাঁ বলুন"।

"একটা পুড়ে যাওয়া বডি পাওয়া গেছে। হাইওয়েতে। যা যা টেস্ট করার ফরেনসিক করছে... ডি এন এ টেস্ট করাটা দরকার বুঝলেন। আর আজ বিকেল থেকে আপনি কলকাতাতেই ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ। আমি কলকাতাতেই ছিলাম। ও অফিসে গেছিল। আপনি চাইলে ওর কলিগদের নাম্বার আমি আপনাকে পাঠাতে পারি"।

"হু। না। আপনাকে সন্দেহের তালিকাতে রাখিও নি। সেটা কথা না"।

"আমি বলছি কি..."

"বলুন"।

"একটা ফোন পেয়েছি। ওর পুরনো একটা ফোন। আমার মনে হয় ফোনটা পেলে আপনাদের উপকার হবে। আর ডি এন এ টেস্টিং এর জন্য কী কী লাগবে..."

"আমি এখনই আসছি। আপনি আছেন তো?"

"হ্যাঁ, আমি আর কোথায় যাব?"

"আসছি আসছি"।

ফোনটা কেটে গেল।
বুকে কেউ যেন ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি মেরে চলেছে। পুড়ে যাওয়া শরীর? পর্ণার শরীর? আবার সব এলোমেলো হতে শুরু করে দিল। টাকার ব্যাগটা কিছুতেই হাত ছাড়া করা যাবে না। পর্ণা না থাকলেই বা কী? এই ব্যাগটাই সব কিছুর পাসওয়ার্ড তার। বাকি জীবনটার। আর কী আছে পর্ণার নামে? আর কী যেন? কী যেন? কী যেন? পালাতে হবে না তাকে। পালাতে না হলেই তো সব থেকে ভাল হয়। পর্ণার ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হবে না। কথার চাবুকগুলো নিতে হবে না রোজ রোজ। অসহায়ের মত নিজেকে আর পিন্টোকে একই গোত্রে ফেলতে হবে না!
হাওয়া দিচ্ছে জানলার বাইরে একটা। মুক্তির হাওয়া? স্বাধীনতার হাওয়া? অনিমেষ আনন্দিত হতে গিয়ে হল না। এখন অভিনয় শুরুর সময়। অরুণাক্ষ আসবেন। তাকে দুঃখে ভেঙে পড়তে হবে।
মেয়েটা তাকে পুরো ঢপ মেরে কাকে না কাকে নিয়ে শুতে গেছিল! রেগুলার করত এরকম নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই এর ওর তার সঙ্গে শুয়ে বেড়াত! শালা খানকি মাগী! বেশ হয়েছে তুই মরেছিস! বেশ হয়েছে। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল অনিমেষের। ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে বিষ ঠাণ্ডা অনেকখানি জল খেয়ে নিল সে। কলিং বেল বাজল।
অনিমেষ দরজা খুলল। অরুণাক্ষ বললেন, “ফোনটা দিন”।
অনিমেষ বলল, “বসুন। ভিতরে আসুন”।
অরুণাক্ষর হাতে ফোনটা দিয়ে অনিমেষ নিঃশব্দে কান্নার অভিনয়টা শুরু করল। এই ধরণের কান্না শুরু করার আগে পৃথিবীর সব দুঃখ মনে করতে হয়। অনিমেষ ছোট বেলা থেকে ভাবা শুরু করল। ক্লাস সিক্সে হঠাৎ একদিন ঠাকুরদা চলে গেল। তারপর মেজো কাকা। একদিন দুম করে বাবা মরে গেল। আহ... কত কষ্ট। আয় কষ্ট ঝেঁপে, টাকা দেবো মেপে...
অরুণাক্ষ “জানু”র নাম্বারটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আইটি সেলে পাঠিয়ে দিল নাম্বারের লোকেশন বের করার জন্য। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, “আমি জানি শেষমেশ ওই বডিটা আপনার স্ত্রীরই হবে নাকি অনিমেষবাবু, তবে নিজেকে সামলান। যদি ঘটনা সত্যি হয়, তবে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনি একটা বেটার জীবন ডিজারভ করেন। আমি দেখছি উনি কোন ট্র্যাপে পড়েছিলেন নাকি। যদি পড়ে থাকেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, খুনি যেখানেই থাকুক, দরকার হলে কবর থেকে তুলে সে খুনিকে খুঁজে বার করব আমি। আপনাকে কথা দিলাম। আসি। ভাল থাকবেন”।
অরুণাক্ষ বেরিয়ে গেলেন।
অনিমেষ দরজা বন্ধ হো হো করে হাসতে শুরু করল।
আজ থেকে সে রাজা। নিজেই নিজের রাজা...

২৩

।। “আজীবন শুধু ভুল” ।।

অনন্যা ভাল, অনন্যা সেক্সি। আর তার মত ছেলেরা অনন্যাদের পায় না। তাদের কপালে জোটে রণিতা। রাগী রাগী মুখ, সব সময় ঝেড়ে চলেছে। শীলভদ্রর মনে পড়ে দুধের লাইনে সে যখন গলদঘর্ম, তখন অনন্যা টিউশন পড়তে যেত। সদ্য যৌবনা অনন্যা, তার ঠোঁটের কোণের তিল, পাগল করে দিত। কিন্তু আড়চোখে দেখা ছাড়া সে কীই বা করতে পারত? কিচ্ছু না। তার কিছুই করার ছিল না।
সে কেবল দেখে গেছে কেবলরামের মত। ফুলসজ্জায় রণিতা জিজ্ঞেস করেছিল, “ক’টা প্রেম করেছো সত্যি করে বল তো এখন অবধি?”
শীলভদ্র বলেছে, “একটাও না”।
যেটা বলে নি, সেটা হল সে অনন্যাকে কল্পনা করে তার যৌবনের তরল প্রায় সবই বাথরুমে বইয়ে দিয়েছে। রণিতা মারাত্মক খাণ্ডার, তাকে উঠতে বসতে ঝাড়ে। এই কিছুক্ষণ আগেও ঝাড়ল। কারণ কিছুই না। সে একটু হাঁটছিল। ফিরতেই রণিতা সবার সামনেই চেঁচিয়ে উঠল, “কী সমস্যাটা কী তোমার? এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? পেছনে কি স্প্রিং লাগানো আছে নাকি? না আমার কাছে বসতে সমস্যা হচ্ছে?”
শীলভদ্র সভয়ে চারদিকে তাকাল। এটা একটা সমস্যা। রণিতা লোক মানে না। সবার সামনেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। চারপাশের মানুষজন বোঝে শীলভদ্র আদতে একটি ভেড়া। রণিতার পোষা ভেড়া। তার চোখের সামনে দিয়ে অনন্যাকে নিয়ে ছেলেটা চলে গেল। সে হাকু পাকু করে আরেকবার জানতে গেল তাদের বোর্ডিং এর ব্যাপারে, পরিষ্কার জানিয়ে দিল অপেক্ষা করুন। এটাই তো হয়। যাদের কপালে প্রাপ্তি লেখা থাকে, তারা খালি পেয়েই যায়। আর যাদের কপালে চুতিয়া লেখা থাকে, তাদের হাল শীলভদ্রর মতন হয়।
রণিতা বলল, “তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। সত্যি করে বল তো কী কেস? তুমি এরকম পাগলের মত এদিক সেদিক করছ কেন? তখন চিৎকার দেবার পরেও দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছ। কী হয়েছে?”
শীলভদ্র মিইয়ে গিয়ে বলল, “কী করব বল? কোন কাজ নেই তো। এতক্ষণ বসে থাকা যায়? এর থেকে তো ট্রেন ধরলে ভাল হত। ভোরে পৌঁছে যেতাম। নেহাত টিকেট পেলাম না বলে”।
রণিতা বলল, “তা পাবে কেন? তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এমন এমন সব কাজ করবে, মাথা খারাপ করে রেখে দেবে। অকম্মার ঢেঁকি একটা। জানিনা পৌঁছে কী দেখতে হবে কে জানে। কী করে রেখেছ কে জানে। বেড়াতে যাচ্ছি না মরতে যাচ্ছি জানি না। চেয়ারে বসে বসে পিঠ ব্যাথা হয়ে গেল। দিদিরা বলে কীসব লাউঞ্জ না কী আছে এখানে, সেসবও তো জানো না? তাই না?”
শীলভদ্র বলল, “লাউঞ্জ? না আমি সেসবের নাম শুনি নি”।
রণিতা বলল, “তা শুনবে কেন? কোন কম্মে লাগার লোক তো তুমি নও। আমার মাথা খেয়ে যাওয়া ছাড়া তোমার আর কাজই বা কী আছে? খোঁজ নিতে হয় বুঝেছ? দেখতে হয়। আর নইলে বাড়ি থেকে পরে বেরোলেই হত। কেন টেনে টেনে নিয়ে এলে? ভোরের ফ্লাইট হলে কি সবাই তোমার মত মাঝরাতে চলে আসে নাকি?”
শীলভদ্র করুণ চোখে চারদিকে দেখল। এখন অনন্যাও নেই যে ওকে দেখে রণিতার দেওয়া ব্যথার মলম দেওয়া যাবে মনে। অনন্যার বয়ফ্রেন্ডের মত হতে পারল না কেন সে?

হুট করে বিয়ে করে নেওয়া মানে এত সমস্যা জানলে কে বিয়ে করত? বিয়ে তো না, যেন সমস্যার পাহাড়। একটার পর একটা সমস্যা। আর রনিতার বাড়ি তো না, যেন রাবণের বংশ। একটা না একটা বিয়ে লেগেই রয়েছে। সব বিয়ের জন্য রণিতাকে আলাদা আলাদা করে সাজতে হবে। ড্রেস কিনতে হবে। বাপের বাড়িতে সে কত ভাল আছে দেখানোর জন্য তাদের দুজনকেই তুমুল ভাল সেজে যেতে হবে। সেভিংসের সবটা রণিতাই নিয়ে যায়। তাও রণিতা অনন্যা নয়।
তারা ঘুরতে যাবে। ঘুরে ফিরে আসবে। আরো অনেক টাকা খসবে। খাবলে খুবলে একটা দাম্পত্য তৈরি হওয়া ছাড়া কিছুই হবে না আর।
ঈশ্বর একচোখাই নন। তাদের মত মানুষদের জন্য ওর অস্তিত্বই নেই।
সব থেকে বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে শীলভদ্র চোখ বুজল। লাভ নেই। রণিতার পাশে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া সে কীই বা করতে পারে?

২৪

।। "অনুভবে তোমারে যে পাই" ।।

ফ্লাইটে কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ থাকে। কতজন পারফিউম দেয়। এয়ার হোস্টেসগুলো গায়ের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যায়। ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলো হল উন্নত প্রজাতির ভলভো বাস। একইভাবে কোন জায়গা থেকে চলে এসে আরেক জায়গায় চলে যায়। এয়ারহোস্টেসরা তুমুল স্মার্ট, তাদের হাসি মাতাল করে দেয়।

জানলার পাশে বসল অনন্যা। তার চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত কিছুক্ষণ পরে। রজত মাঝে বসেছে। তার বাঁ দিকে কেউ বসে নি। ফাঁকা যাবে। মুম্বই যেতে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লাগবে। মেয়েটার নেশা কখন কাটবে পুরোপুরি? নেশা কেটে গেলে যদি বলে ফিরে যাবে?

গেলে যাবে। রজত নিজের মনে হাসল। চোখ বন্ধ করে পর্ণার শরীরটা মনে করতে লাগল। রক্তাক্ত একটা শরীর, কামাসক্ত হতে হতে শেষ হয়ে যাওয়া একটা শরীর। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা এত সোজা নয়। ইটের উপরে ইট গেঁথে গেঁথে বাড়ি তৈরি করার মত হয় ব্যাপারটা।

অনন্যার ক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট, সিঙ্গল মল্ট আর তার একাকীত্ব মারাত্মক অণুঘটকের কাজ করেছে। সবার ক্ষেত্রে করে না।

রূপসা ছিল বালিগঞ্জের। বর আইটি সংস্থার আধিকারিক। ফেসবুকে আলাপ হল। সেখান থেকে সাউথসিটিতে দেখা হল একদিন। রূপসার দ্বিধা ছিল। ওকে ভাঙা ছিল প্রচণ্ড কঠিন। প্রথমেই বুঝতে পেরে গেছিল রজত। চেষ্টাও করে নি। বন্ধু হয়ে থাকবে, এটুকুই। রূপসা কত কত ছবি দিত সোশাল মিডিয়ায়। কত জায়গায় যাচ্ছে, কত কিছু খাচ্ছে। দামী গয়না কিনছে। কত খুশি! খুশির যদি কোন মিটার থাকে, তাহলে সোশাল মিডিয়ার নিরিখে রূপসার খুশি হয়ত একশোতে একশো কুড়ি ছিল। তবু রজত জানত রূপসা একদিন ভাঙবে। ভাঙবেই।

ভাঙলও অদ্ভুতভাবে। এক বৃহস্পতিবার রাত তিনটের সময় পিং করল। "জেগে নাকি?"

রজত নিজের মনেই হেসে উত্তর দিয়েছিল, "হ্যাঁ"।

"কী করছ। প্রেম?"

"ধুস। ওসব করার সময় কোথায়?"

"হু? সত্যিই সময় নেই নাকি?"

"একবারেই না। কাজ করছিলাম। অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে আসার ঝক্কি আর কী"।

"ওহ তুমিও কাজ করে যাচ্ছ? তাহলে ডিস্টার্ব করলাম। থাক"।

"আরে না না। থাকবে কেন? বর কোথায়?"

"নেই। চেন্নাই গেছে"।

"আচ্ছা"।

"মন খারাপ?"

"না না। সেসব কিছু না"।

"ওকে"।

"তুমি এখনও রাতে বাইক নিয়ে বেরোও?"

"বেরোই তো?"

“ধুস! বিশ্বাস হয় না”।

“বিশ্বাস না হবার কী আছে? জাস্ট শেয়ার ইয়োর লোকেশন, দেখো আসছি নাকি”।

“তাই নাকি? ওকে শেয়ারিং”।

“ফাইন। গিভ মি থার্টি মিনিটস”।

তৈরি হতে পাঁচ মিনিট নিয়েছিল রজত। ঠোঁটের কোণে হাসি। এটাই হল সংযমের দরজা ভাঙার প্রথম ধাপ। সে দেরী করল ইচ্ছে করেই। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছল। বাইক রেখে দেখল তার ফোনে তিনটে মিসড কল। কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলে তাকে দেখে হাসল। “দেরী হল তো”।

রজত হেলমেটটা টিভির পাশে রেখে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, “তা হল। বয়স হচ্ছে। এখন তাড়াহুড়ো না করাই ভাল। তাই না?”

রূপসা তার সামনে এসে বসল।

এই সময়টা রজত সময় দেয়। এই সময়ে একবারেই তাড়া দিতে নেই। তাড়া দিলে প্রতিপক্ষের মনে রেজিস্টেন্স তৈরি হয়ে যায় যেটা তাকেই খলনায়ক বানিয়ে দেবে।

রূপসা তার দিকে হেরে যাওয়া চোখে তাকাল একটা সময়। রজত তখনও হাসল না। হাসতে নেই। এই সময়টা তার জয়ের সময়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের জালে আরো বেশি করে জড়িয়ে নেওয়ার সময়।

রূপসাকে সে ওদের বাড়িতেই মেরেছিল। আরেকদিন রাতের বেলা। সেরাতে বাইক নিয়ে যায় নি। ক্যাবে করে গেছিল।

রূপসার একাকীত্ব ছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেখা গেল বেঁচে থাকার চাহিদাও ছিল। মরার আগে প্রাণভিক্ষা করছিল বার বার। রজত ততদিনে জেনে গেছে মেয়েটার বাপের বাড়িতে এক দাদা ছাড়া কেউ নেই। দাদা-বউদির সঙ্গে রূপসার একবারেই সম্পর্ক ছিল না। রূপসার বরের অ্যাফেয়ার ছিল।

পুলিশ রূপসার বরকেই ধরেছিল। রজত দু সপ্তাহ দিল্লিতে কাটিয়ে ফিরেছিল। ওর বরের দিকে সন্দেহের তীর এমনিই যেত। দু দিন পর পর বাড়িতে তুমুল ঝগড়া লাগত। রজতকে আঁকড়ে ধরেছিল রূপসা। নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।

রজতও সেটাই চেয়েছিল। যত বেশি বিশ্বাস করবে মানুষ, তত বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করে মজা। নইলে কোন লাভ নেই।

অনন্যা তার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিশ্বাস করছে। রজতের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

২৫

।। "পৃথিবী আবার শান্ত হবে" ।।

ভোর হচ্ছে। পিন্টো এবার উশখুশ করবে। ওকে ঘুরতে নিয়ে যেতে হয়। অরুণাক্ষ আবার ফোন করেছিলেন। তাকে ল্যাবে যেতে হতে পারে। বডি আইডেন্টিফাই করতে হবে।

অনিমেষকে কী করতে হবে? তাকে কাঁদতে হবে। চোখে মুখে শোক আনতে হবে। তারপর টাকাটা কী করে খরচ করবে, তার হিসেব করতে বসতে হবে। পর্ণা টাকাটা কারো থেকে ধার করে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে লোকটা টাকাটা নিতে আসবে। তাহলে কি বাড়িটা ছেড়ে দেবে সে? দেওয়াই যায়। না দেওয়ার কিছু নেই। আগের রাতের সোনাগাছির কথা মনে পড়ে গেল। এরপর সেখানে যাওয়ার প্রবৃত্তি হবে না হয়ত আর। বউ মানে তো একটা সুস্থ, স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সঙ্গে যৌন মিলন। সোনাগাছির মেয়ে মানে স্বাস্থ্য, সুস্থ, এসব আশা করা যাবে না। ঘামে লেপটে, বহুজনের ভোগ করে যাওয়া কোন মেয়ের গায়ের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে আসা। ঘিনঘিনে এবং গ্যাদগ্যাদে একটা ব্যাপার। কোন দরকার নেই। আরো ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। খোঁজ নিতে হবে। কিংবা একটা স্বাস্থ্যবতী গ্রামের মেয়ে বিয়ে করা যায়। সংসার করবে, খ্যাচাবে না। কিন্তু এখনই বিয়ে করলে কথা হবে। আগে প্রতিষ্ঠা হতে হবে পর্ণা তাকে ঠকিয়েছিল। লোকের চোখে সহানুভূতি জাগাতে হবে। সহানুভুতির ঢেউয়ে নেতারা ভোট অবধি জিতে যায় আর এ তো খুব সামান্য ব্যাপার। কলিং বেল বাজল। অনিমেষ বিরক্ত হল। আবার অরুণাক্ষ এসেছে। এ লোক আসা মানেই তাকে আবার অভিনয় শুরু করে দিতে হবে। অভিনয় তো সে মন্দ করছে না গত রাত থেকে। তবু ক্লান্তি আসাটাও অস্বাভাবিক না। দরজা খুলল সে।

অরুণাক্ষ বললেন, "ওই সিমটার নাম্বারটা মুর্শিদাবাদের কোন এক এমানুল হকের নামে নেওয়া। ওখানে খবর পাঠিয়েছি। আর লাস্ট লোকেশন পাওয়া গেছে এয়ারপোর্ট। ফোনটা আমার কাছেই রাখছি। আরো কাজ আছে, বিস্তারিত পরে জানাবো আপনাকে। ওকে?"

অনিমেষ বলল, "ঠিক আছে। রাখুন। কোন অসুবিধা নেই। কোথায় পাওয়া গেছে ট্রেস করে বললেন? কলকাতা এয়ারপোর্ট?"

অরুণাক্ষ বললেন, "হ্যাঁ। তারপর ফোন অফ করে দিয়েছে। আপনি ফোন করেছিলেন?"

অনিমেষ বলল, "হ্যাঁ। আমি তো ড্রয়ারে ফোনটা পেয়েই অবাক হয়ে গেছিলাম"।

অরুণাক্ষ মাথা নাড়লেন, "সেটা স্বাভাবিক। ফিলিং সরি ফর ইউ। আপনি ঠিক আছেন তো? আত্মীয় স্বজনদের কিছু খবর দিলেন?"

অনিমেষ মাথা নিচু করল, "নাহ। আমি কাউকে কিছু বলব না"।

অরুণাক্ষ কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দিকে কিন্তু সন্দেহের তীর আসতে পারে। সেটা ভেবে দেখেছেন? কেউ বলতেই পারে আপনিই কন্ট্র্যাক্ট কিলার লাগিয়ে খুন করিয়েছেন"।

অনিমেষ ভিতরে ভিতরে সামান্য চমকালেও মুখে সেটার কোন প্রতিফলন আনল না। বলল, "আপনি তো সবটা দেখলেন। কাল রাতে যা যা হয়েছে, তার সবই আমি আপনাকে বলেছি। আমি যদি ওকে খুন করতে যাব, তাহলে এই ফোনটা খুঁজে আপনাকে কেন দেব বলুন?"

অরুণাক্ষ চিন্তিত মুখে বললেন, "তাও ঠিক। আপনি ক্লিয়ার আছেন। খুব সম্ভবত আপনার স্ত্রী কোন অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কার সঙ্গে কথা বলতেন, কোথায় কোথায় যেতেন, এ সব ব্যাপারে ঠিক

ঠাক তদন্ত হলে কোন একটা জায়গায় আমরা ঠিক পৌঁছে যাব"।
অনিমেষ মাথা নিচু করেই বসে ছিল। বলল, "আপনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই আমি চলব। আমার আলাদা করে কিছু ভাবনা চিন্তা করার নেই এখন। আমি আমার মতই চলছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম যে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। আবার সব কেমন হয়ে গেল"।
এবার একটু অভিনয়। দুহাত মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।
অরুণাক্ষ বললেন, "আমি কেসটা সি আই ডিতে রেফার করব অনিমেষবাবু। আমি জানি না আপনাদের দাম্পত্য ঠিক কোন জায়গায় ছিল, তবে আপনার জন্য আমার খারাপ লাগছে। যোগাযোগ রাখব। কোন আপডেট হলে নিশ্চয়ই আপনি জানতে পারবেন"।
অনিমেষ বলল, "আমি একটা ফেইলিওর। কিছু করতে পারলাম না জীবনে। কী থেকে কী হয়ে গেল!"
আহ... ডায়লগটা বলে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিল অনিমেষ।
অরুণাক্ষ বললেন, "কিচ্ছু ফেইলিওর না। এসব ঘটে। চিন্তা করবেন না। আপনি বিশ্রাম করুন। পারলে ঘুমনোর চেষ্টা করুন। আমি না হয় বিকেলে একবার ফোন করব?"
অনিমেষ চোখ মুছে মাথা নাড়ল। একটা দামী ক্যামেরা কিনবে ঠিক করল মনে মনে। টাকা থাকার কত সুবিধা। ইচ্ছা মত জিনিস কিনতে পারা যায়। এই ক্যামেরা দিয়ে সে নিজের অভিনয়ের ভিডিও করবে। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল, সে অভিনয় করে ফাটিয়ে দিচ্ছে।

২৬

।। "ভুল সবই ভুল" ।।

"কোথায় গাড়ি? কোথায়?"
এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই চিৎকার শুরু করল রণিতা। শীলভদ্র ট্রাভেল এজেন্টের নাম্বারে ফোন করে হতভম্ব হয়ে গেল। নাম্বারটা সুইচড অফ। যাহ শালা! মহা জ্বালা হল তো!
সে রণিতাকে বলল, "ফোন অফ করে রেখেছে। অন্য গাড়ি করছি"।
রণিতা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "অফ করে রেখেছে? জানতাম। নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স করে রেখেছ?"
শীলভদ্র মিথ্যে বলল, "না না। এখানে এসে দিতাম তো"।
রণিতা বলল, "এখানে এসে দিতে? এসব ঢপ বোঝাচ্ছ আমাকে? এবার কী হবে?"
একটা দালাল এসে বলল, "স্যার, গ্যাংটক যাবেন?"
শীলভদ্র বলল, "হ্যাঁ। কত পড়বে?"
দালালটা বলল, "চার হাজার টাকা স্যার"।
শীলভদ্র বলল, "বেশি দাম বলছ কেন?"
রণিতা বলল, "বলবেই তো। তুমি এখানে এসে গাড়ি ঠিক করলে দাম বেশি বলবে না? আমি কোথাও যাব না। চল কলকাতা ফিরে যাই?"
শীলভদ্র বলল, "অ্যাঁ? যাবে না?"
রণিতা বলল, "না যাবো না"।
দালালটা বলল, "তিন হাজার ন শো দেবেন স্যার। চলুন"।
শীলভদ্র উপায় না দেখে বলল, "তাই চল। এই ওঠো"।
রণিতা গালাগাল দিতে দিতে গাড়িতে উঠল।
শীলভদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই তো তার জীবন। বউয়ের ঝাড় খেতে খেতেই চলে গেল। এটাকে বেঁচে থাকা বলে?
গাড়ি চলতে শুরু করলে রণিতা বলল, "এরপর নিশ্চয়ই গ্যাংটকে পৌঁছে দেখব হোটেলও ঠিক নেই"।
শীলভদ্র ঢোক গিলে বলল, "আগে তো যাই। গিয়ে কিছু না কিছু একটা পেয়ে যাবো ঠিক"।
রণিতা বলল, "আমি কী দেখে যে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম কে জানে! কোন মানে হয়?" ড্রাইভার বলল, "হোটেল নিয়ে চিন্তা করবেন না স্যার। যে কোন রেঞ্জে হোটেল ঠিক করে দেব। ওখানে অনেক হোটেল আছে"।
রণিতা গজগজ করতে করতেই চোখ বুজল। নাক ডাকতে শুরু করল তার।
শীলভদ্র ফেসবুক খুলে অনন্যার প্রোফাইল সার্চ করল।
আইব্বাস! মেয়ে তো গ্যাংটকেই চাকরি করে! তাহলে কোথায় গেল?
অন্য কোথায় চলে গেল ছেলেটার সঙ্গে? এই তো জীবন কালীদা!
আর সে কী করছে? খাণ্ডার বউয়ের খপ্পরে পড়ে পাতি ছিঁড়ছে।
পাহাড় শুরু হলে ছোটবেলায় তার কত আনন্দ হত। মাঝে মাঝেই গাড়ি দাঁড় করানোর আবদার করত। এখন সেসব কোন অনুভূতিই হল না। যেন যেতে হচ্ছে বলে যাওয়া। যাওয়ার কোন আনন্দ নেই, কিসসু

নেই। ঘুরবে। দিন ফুরোলে কলকাতা ফিরে যাবে। আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া জীবন। ওই ছেলেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টেই আলাপ হয়েছে অনন্যার। সে যদি ওই ছেলেটার মত জীবন পেত? দীর্ঘশ্বাস ফেলল শীলভদ্র। ইচ্ছে হচ্ছে গাড়ির দরজাটা খুলে রণিতাকে ঠেলে ফেলে দেয়। পারবে না সে। ক্রমাগত বউয়ের ঝাড় খেয়ে যাবে। এটা কেন হল না? ওটা কেন হল না। আজকাল অফিসের বসকে দেখলে ভগবান মনে হয়। ওরকম একটা খচ্চর বুড়ো যেন দেবদূতের মত! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "স্যার, আপনি কিসসু পারেন না। একবারেই ঝাড়তে পারেন না। পারলে রণিতার কাছ থেকে শিখে আসবেন কী করে ঝাড়তে হয়। আপনি একবারেই জানেন না স্যার, ঝাড়াটা একটা আর্ট। কীভাবে পদে পদে ঝাড়তে হয়, আমার বউ জানে। আপনি কী? আপনি কিসসু না। আপনার দ্বারা হবে না স্যার। আপনি একটা লুজার। রণিতাকে পাঠাচ্ছি। টিউশন নিন"।

অথচ জীবনটা তো অন্যরকমও হতে পারত। সে সোলো ট্রিপে গ্যাংটক যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে অনন্যার সঙ্গে দেখা হল।

রাস্তায় কথা বলতে বলতে অনন্যা তার প্রেমে পড়ে যাবে। পাহাড়ি রাস্তায় ভয় পাবে মেয়েটা। তার হাত শক্ত করে ধরে থাকবে!

এসব কিছুই হল না। কিছু হবেই না। "এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে"।

কোথায় যেন পড়েছিল ছোটবেলায়? ধুস! মনেও পড়ে না আর! যতসব!

২৭

।।"এসো আমার ঘরে"।।

"এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায় এবার?"

তাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর লাগেজ বেল্টের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনন্যা প্রশ্ন করল।

রজত বুঝল নেশা নামলেও অনন্যা পাল্টায় নি। রজতের ঘোরে চলে এসেছে। এবার তার হাতেই থাকবে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

রজত বলল, "তুমি কোথায় যেতে চাইছো? কোন হোটেলে? না লং ড্রাইভে?"

অনন্যা বলল, "আমি একটু ল্যাদ প্রকৃতির আছি। কোন জায়গায় গিয়ে যদি ঘুমোতে পারতাম ভাল হত। তারপর লং ড্রাইভে যাওয়াই যায়"।

রজত বলল, "নট এ ব্যাড আইডিয়া। তাহলে কোন হোটেলেই যাওয়া যাক"।

অনন্যা বলল, "লেট মি চেক। আমি হোটেল বুক করছি"।

রজত বলল, "অ্যাজ ইউ উইশ"।

এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে ক্যাব পেয়ে গেল তারা। হোটেলে চেক ইন করতে কোন সমস্যা হল না। ঘরে ঢুকে কোনমতে লাগেজ রেখে অনন্যা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করল।

এ তো তারই অঞ্চল। এখানে সেই রাজা। গতকাল ছিল পর্ণা। এখন অনন্যা। দুজনে মেতে উঠল উদ্যাম যৌনতায়। অনন্যাকে উত্তেজনার শিখরে পৌঁছে দিল রজত। অনন্যা ভার্জিন। ব্যথায় ককিয়ে উঠল। তবু রজত থামল না। কিছুক্ষণ পর তাকে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে অনন্যা বলল, "বাড়িতে জানালে কুরুক্ষেত্র হবে। আমি এখন কিচ্ছু বলব না বাড়িতে। কাল বাগডোগরা চলে গেলেই হবে। একটা দিন শুধু ঢপ মেরে কাটিয়ে দেব"।

রজত অনন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তাই কোর। তোমার যেমন ইচ্ছে"।

অনন্যা রজতের বুকে চুমু খেয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ"।

রজত বলল, "ফর হোয়াট?"

অনন্যা বলল, "এভাবে আমার জীবনে আসার জন্য। এবার বল"।

রজত বলল, "কী বলব?"

অনন্যা বলল, "তোমার সম্পর্কে? নাকি বলতে চাও না?"

রজত বলল, "কেন বলব না? আমি তো খোলা পাতার মত। কী আর বলি? নর্থ ক্যালকাটার ছেলে, আই আই এম থেকে বেরিয়ে নিজের একটা স্টার্ট আপ করেছি। চেষ্টা করে চলেছি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার"। সে খুব স্বাভাবিকভাবে মিথ্যে বলতে পারে। তার কথা একটুও বিকৃত হয় না।

অনন্যা বলল, "হাউ এক্সাইটিং। আর আমাকে দেখো। বোরিং কাজ করে করে আরো বোরিং হয়ে গেলাম! সারাক্ষণ স্টুডেন্টদের অ্যাসাইনমেন্ট দাও। সেগুলো না পেলে খ্যাট খ্যাট কর। চিৎকার কর। ধুস ধুস। বিচ্ছিরি লাইফ।"

রজত বলল, "জয়েন মি। আমার সঙ্গে আসবে?"

অনন্যা রজতের বুকে মুখ রেখে বলল, "আসব। তুমি তো এসেইছো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। কী কী কাজ করতে হবে?"

রজত বলল, “অনেক কাজ। একটা স্টার্ট আপের অনেক কাজ থাকে। অনেক ট্রাভেলও করতে হয়। তোমার সম্পর্কে কিছু বল”।

অনন্যা বলল, “আমি আর কী বলব? আমার...” অনন্যার ফোন বেজে উঠল। সে খাটের উপর উঠে বসে রজতের দিকে ঠোঁটে আঙুল দেখিয়ে বলল, “চুপ চুপ। বাবা ফোন করছে”।

রজত চুপ করে গেল। অনন্যা ধরল, “হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাগডোগরা নেমে গেছি। পৌঁছে জানিয়ে দেব। আর কী? ওষুধ? আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে”।

ফোন কেটে দিল অনন্যা। রজত বলল, “কীসের ওষুধ?”

অনন্যা বলল, “মেয়েলি রোগ। ওসব জেনে আর কী করবে? দাঁড়াও গিলে নি”।

ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে খেয়ে নিল অনন্যা। রজত বলল, “বাড়িতে মিথ্যে বললে কেমন কেমন লাগে, তাই না?”

অনন্যা বলল, “এখন বলব না তো আর কবে বলব? কোথায় নিয়ে যাবে গো আমাকে আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর?”

রজত বলল, “একটা অ্যাপ আছে। গাড়ি আমিই চালাবো। ওরা গাড়ি সাপ্লাই দেবে। বুক করে নি। তারপর না হয় ঠিক করব কোথায় যাওয়া যায়। তোমার কী ভাল লাগে? পাহাড় না সমুদ্র?”

অনন্যা বলল, “সারা বছর তো পাহাড়েই কাটিয়ে দিচ্ছি। এখন আর পাহাড় ভাল্লাগে না। এককালে লাগত। এখন সমুদ্র”।

রজত বলল, “বেশ তো। মহারাষ্ট্র গোয়া বর্ডারে দারুণ দারুণ লোনলি ডেসটিনেশন আছে। কেউ যায় না। একটা হানিমুন করাই যায়”।

অনন্যা রজতের পেটে আঙুল দিয়ে চুমু খেল। বুকে চুমু খেয়ে রজতের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এল চুমু খেতে খেতে।

রজত অনন্যার ঠোঁটে ডুবে গেল। প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল অনন্যার গলা টিপে দিতে, বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল সে।

এ খেলা তো টি টোয়েন্টি নয়। ওয়ান ডেও নয়।

এ খেলা টেস্ট ক্রিকেট। ধরার বলে ধরতে হয়, ছাড়ার বলে ছাড়তে হয় আর মারার বলে...

২৮

।। "এই পথ যদি না শেষ হয়" ।।

জিপেই ঘুমিয়ে পড়েছিল কৌশিক। ঘুম ভাঙল এস পি সাহেবের ফোনে। ধরল সে, "হ্যাঁ স্যার"।
"কৌশিক"।
"বলছি স্যার"।
"কাল রাতে, ওই পুড়িয়ে ফেলার টাইম স্প্যানের মধ্যে একটা গাড়ি ডানকুনি টোল থেকে বেরিয়ে পালসিট না গিয়ে আবার ডানকুনি দিয়েই বেরিয়েছে। গাড়িটা একটা অ্যাপ কোম্পানির। আমি সি আই ডিতে ডিটেলস দিয়েছি। নিখোঁজ মহিলা সম্পর্কে কিছু জানা গেল?"
কৌশিক কোন খোঁজই করে নি। সেটা বললে ঝাড় খাবে। মিথ্যে বলে দিল, "লোকাল না স্যার"।
"সে তো জানি। খোঁজ পাওয়া গেছে। অ্যাপ কোম্পানিতে যে ছেলের নামে গাড়ি বুক হয়েছিল, নিশ্চয়ই দেখা যাবে সে নাম ভুয়ো বা অন্য কিছু। তবে শুয়োরের বাচ্চা ধরা পড়বে। পালিয়ে কোথায় যাবে? কলকাতার খবর হল ওই মালকে এয়ারপোর্টে দেখা গেছে। ওখান থেকে অন্য কোথাও পালাবে আর কী। তুমি এক কাজ কর তো, কোথায় আছো এখন?"
"স্পটেই আছি স্যার"।
"দিনের আলোয় আরেকবার স্পটটা দেখো। কিছু পাওয়া যায় নাকি দেখো। গেলে জানায়"।
"ওকে স্যার"।
ফোন রেখে কৌশিক বিরক্ত মুখে বসে রইল। লাইটারটার কথা এবারেও বলা হল না। আর বলতে হবে না। গাড়ি থেকে নামল সে। মাটির উপর একটা বস্তা পোড়ানোর পর যেমন কালো দাগ হয়ে যায়, সেরকম দাগ হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে গাড়ির চাকার দাগ ক্ষীণ হয়ে আছে। আর কী আছে? কৌশিক দেখার চেষ্টা করল। কী আছে, কী আছে... হাঁটতে হাঁটতে সে স্পট ছাড়িয়ে চলে গেল খানিকটা। ক্ষেত শুরু হচ্ছে।
কৌশিক সিগারেট ধরাল। একটা মেয়েকে মারার জন্য একটা লোক এত দূর এসেছে। ডানকুনি থেকে এখানে এসে মেয়েটাকে পুড়িয়ে দিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেছে। লোকটা কোথাকার ছিল? বাইরে থেকে এসেছিল? কেন এসেছিল? তার হঠাৎ প্রবল কৌতূহল হল। সে এস পি সাহেবকে ফোন করল। বীরেশ ধরলেন, "বল কৌশিক"।
"স্যার, আপনি যে মহিলার ছবি পাঠালেন, আমাকে ওর ঠিকানাটা পাঠাবেন?"
অবাক হলেন এস পি, "কেন বল তো? কী করবে?"
"এমনি স্যার। নর্থ ক্যালকাটায় আমার কয়েকজন আত্মীয় স্বজন আছে। ওরা যদি চেনে"।
"ওকে। আমি পাঠাচ্ছি"।
"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"।
ফোনটা রেখে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কৌশিক। ঠিকানাটা এসে পৌঁছেছে। সিধু গাড়ির ড্রাইভারের পাশের সিটে ঘুমোচ্ছিল। কৌশিক সিধুকে ঠেলে বলল, "আমি বেরলাম। কলকাতা যেতে হবে জরুরি কাজে। কেউ খোঁজ করলে বলবে আমি আজ ছুটিতে আছি"।
সিধু বলল, "বাথরুম করে যাবেন না?"
কৌশিক হেসে ফেলল, "এই কথাটাই এখন মনে পড়ল?"

সিধু উঠে বসে বলল, "থানায় চলুন স্যার। ওখান থেকে আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে যাবো না হয়"।
কৌশিক মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।
থানায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ড্রেস পাল্টে আবার হাইওয়েতে এসে কলকাতার বাসে উঠে পড়ল কৌশিক। এস বি এস টি সির বাসগুলো এমনি দাঁড়ায় না। পুলিশের গাড়ি দেখে দাঁড়াল। কৌশিককে কন্ডাকটার সসম্ভ্রমে একটা চেয়ারও ছেড়ে দিল।
কৌশিক বাসে উঠে আবার চোখ বুজল। কলকাতায় ফেরার সময় সে ট্রেনে ফেরে। ঠিকানাটা শোভাবাজারের। এসপ্ল্যানেডে নেমে মেট্রো ধরলে সুবিধা হবে।
ডানকুনির পর বাস শম্বুক গতিতে এগোতে শুরু করল। সাঁতরাগাছিতে আরো জ্যাম। কলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল এগারোটা বেজে গেল। এসপ্ল্যানেডে নেমে কৌশিক মেট্রোয় উঠল। কলকাতার বাইরে যতক্ষণ থাকে, সে মরে থাকে। কলকাতা তার জিওন কাঠি।
অনেকদিন পর তার ভাল লাগছিল। গত রাত্রের রাত জাগা সত্ত্বেও দিনটা অন্যরকম হয়ে উঠছে।
বাড়িটার সামনে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে কৌশিক কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে একটা দাঁড়ি গোঁফওয়ালা লোক তার দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বলল, "বলুন"।
কৌশিক কিছু না ভেবেই বলল, "থানা থেকে আসছি"।
অনিমেষ অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকাল, "আপনাকে তো ঠিক..."
কৌশিক আই কার্ড বের করে অনিমেষের চোখের সামনে তুলে বলল, "আমি কলকাতা পুলিশ নই। রাজ্য পুলিশ। যেটা ঘটনাটা হয়েছে, আমার এলাকায় হয়েছে। কিছু কথা বলার ছিল। ভিতরে আসতে পারি?"
অনিমেষ দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, "আসুন"।

২৯

।। "চোখের আলোয়..." ।।

অনিমেষের বিরক্ত লাগছিল। এক পুলিশ গেলে আরেক পুলিশ আসে। এর থেকে বিরক্তিকর আর কী হয়? এ কী বলতে চাইছে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের চারদিক দেখে যাচ্ছে। পিন্টোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "এ কী কী খায়? শুধু মাংস ভাত?"

অনিমেষ বলল, "পেডিগ্রি খায়"।

কৌশিক অবাক হয়ে বলল, "সেটা কী?"

অনিমেষ বলল, "কুকুরের খাবার। পাওয়া যায়। ওই মাংসই ওদের মত করে মিক্স করে দেওয়া হয়"।

কৌশিক বলল, "ও"।

অনিমেষ উশখুশ করছিল। কৌশিক সেটা দেখল না। বলল, "মিডিয়া খবর পেলে আপনার এখানে আসতে পারে। আপনি কী বলবেন?"

অনিমেষ বলল, "জানি না কী বলব। আমার কিছু বলার নেই। আমি কিছুই জানি না এখনও"।

কৌশিক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার বউকে যে পুড়িয়ে মেরেছে তার উপর আপনার রাগ হচ্ছে না?"

অনিমেষ বলল, "আমার বউয়ের ফোনে একজনের নাম জানু বলে সেভ করা আছে আর সেটা আমার নাম্বার না। রাগটা কার উপর হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?"

কৌশিক কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কাল কলকাতা ছিলেন"।

অনিমেষ বলল, "হ্যাঁ। অনেক রাত অবধি ও বাড়ি না ফেরায় আমি ওর কলিগদের ফোন করি। তারা আমাকে বলল পুলিশে যেতে। আমি লোকাল থানায় বললাম"।

কৌশিক বলল, "আপনার বউকে মেরে, বস্তায় ঢুকিয়ে পেট্রোল দিয়ে ভিজিয়ে পুড়িয়ে একবারে কালো করে দিয়েছে। যে লোকটা মেরেছে, সে কোন লেভেলের সাইকো বুঝতে পারছেন?"

অনিমেষ বলল, "আমি ভাবতে চাইছি না"।

টিভির পাশে তাদের বিয়ের ছবি। কৌশিক বলল, "ওই ছবিটা দেখতে পারি?"

অনিমেষ বলল, "দেখুন"।

কৌশিক ছবিটা নিয়ে এসে বসল। মন দিয়ে কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে বলল, "কাল সারারাত আমি স্পটে ছিলাম। সকালে আমার এত অস্বস্তি হল, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম। আপনি বিরক্ত হয়েছেন?"

অনিমেষ বলল, "আমি বিরক্ত হই বা না হই, তাতে কারো কিছু যায় আসে না কৌশিকবাবু। আমি একটা না-মানুষ। আমার কোন রোজগার নেই। সবাই বার বার এসে আমার দিকেই আঙুল তুলবে, আমাকে দেখে হাসবে। এগুলো হবে। আমার হিসেব করা হয়ে গেছে"।

কৌশিক ছবিটা আরেকবার দেখে বলল, "এই আপনি, আর এখন আপনি, আকাশ পাতাল তফাৎ"।

অনিমেষ বলল, "তখন একটা চাকরি ছিল। চলে যায়। তারপর আমার কনফিডেন্সটাও চলে যায়। বউকে অন্য লোক নিয়ে গিয়ে ঘুরল, না কী করল, আমি কিছুই বুঝলাম না"।

কৌশিক বলল, "আপনার রাগও হচ্ছে না আবার ইনসিকিউরিটিও হচ্ছে না। তাই তো?"

অনিমেষ বলল, "হ্যাঁ। তাই"।

কৌশিক অনিমেষের দিকে তাকাল। লোকটা করুণার পাত্র। সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তবে কিছু লোককে দেখলে বোঝা যায় ওসব কাজ তাদের কম্মো নয়। এই লোক সে ধরণের। এই বাড়িতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেবে! কী বিরক্তিকর! এরা বেরোয় না, ঘরের বাইরে যায় না, পৃথিবীর কাউকে নিয়ে ভাবে না, সারাক্ষণ নিজেকে নিয়েই ভেবে যাবে। গলিঘুঁজির মধ্যেই জন্মাবে, তার মধ্যে সারাজীবন কাটাবে, আরেকদিন কোন এক শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অনাবশ্যকভাবে পৃথিবীর ভার বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া এদের কোন কন্ট্রিবিউশন নেই। থাকাও যা, না থাকাও তা। অদ্ভুত!

কলকাতা আসার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল কৌশিকের। ছবিটার প্রেমে পড়ে গেছিল হঠাৎ করে। তার স্বামী আর বাসস্থান দেখে বিরাগ তৈরি হয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে কলকাতা আসার সিদ্ধান্তটাই ভুল।

লোকটা কেমন যেন। এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে বসার জায়গাটা কেমন চাপ দিয়ে দিয়ে দেখছে। আজব তো! কৌশিক বলল, “আমাকে একটু জল খাওয়াবেন?”

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, “এখনই আনছি”।

রান্নাঘর পাশেই। অনিমেষ তড়িঘড়ি গ্লাস নিয়ে ওয়াটার পিউরিফায়ার থেকে জল ভরতে শুরু করল।

কৌশিকের চোখে পড়ল অনিমেষ যে সোফায় বসে ছিল, তার নিচে একটা ব্যাগ রাখা। অনিমেষ যতক্ষণ বসে ছিল, ব্যাগটা পা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল বলে তার চোখে পড়ে নি।

তার একবার মনে হল উঠে গিয়ে ব্যাগটা দেখে, উঠতে গিয়েও থমকে গেল সে। থাক। দেখার দরকার নেই।

৩০

।। "এ কী হল?" ।।

"আমরা এখন কোথায় যাবো?" অনন্যা জিজ্ঞেস করল।
তার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে অনন্যা।
রজত বলল, "বললাম যে, ঠিক করি নি। এক কাজ কর, তুমি স্নান সেরে নাও। আমি হোটেলের বাইরের এ টি এম থেকে ঘুরে আসি"।
অনন্যা হাসল, "জো হুকুম"।
রজত বেরোল। টাকা তুলতে হবে।
অ্যাপ ক্যাবের সিকিউরিটি মানি দেওয়ার ব্যাপার আছে। সে অনলাইনে দেবে না। ক্যাশে দেবে। অ্যাকাউন্টে অঢেল টাকা পড়ে আছে। রজত দশ হাজার টাকা তুলল প্রথমে। দ্বিতীয়বার টাকা তুলতে গিয়ে দেখাল ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স। রজত অবাক হল। আরেকবার ব্যালেন্স চেক করল।
না। টাকা সত্যিই নেই। এই অ্যাকাউন্টে তার বিয়াল্লিশ লাখ টাকা থাকার কথা ছিল।
মদের দাম সময়ের সঙ্গে বাড়ে। সোনারও। ছোটকাকীমার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সোনা চিলেকোঠাতেই ছিল বহুদিন। রজত গয়নাগুলো বিক্রি করে পর্ণাকে তার একাউন্টে টাকা জমা দিতে বলেছিল। পর্ণা টাকা জমা দেয় নি?
রজতের হৃদস্পন্দন বাড়তে শুরু করল। অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, লাখ সাতেক মত, কিন্তু বিয়াল্লিশ লাখ টাকা পর্ণা জমা করে নি? এত সাহস? কোথায় রেখেছে সে টাকাটা?
রজতের মাথা দপ দপ করছে। এত রাগ উঠছে যে নিজেও সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সে এটিএম থেকে বেরিয়ে আবার হোটেলের রুমে ফিরল। অনন্যা স্নান করছে। রজত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল। সেই রাগ, সেই রাগ... সেই রাগ উঠছে যে রাগে কাকীমাকে খুন করতে দ্বিতীয়বার ভাবে নি সে। পর্ণাকে তো সে জ্বালিয়েই এসেছে। আবার নতুন করে কী মারবে?
ব্যাঙ্কে কাজ করত পর্ণা। অ্যাকাউন্টটাও সেই বানিয়ে দিয়েছিল। তাকে পর্ণা বলেছিল ওই গাধাটাকে ডিভোর্স করে এসে তারা যখন নতুন সংসার করবে, এই টাকা সেই সংসারে খরচ করবে তারা।
টাকাটা তো গতকাল জমা দেওয়ার কথা ছিল। পর্ণা দেয় নি?
দেয় নি... নাকি দিয়েছে, জমা পড়ে নি? নাকি অন্য কাউকে বলে দিয়েছে?
দপ দপ করছে মাথা। রক্ত উঠে আসছে। এখন পর্ণাকে পাবে কী করে সে? সে রাস্তাও তো নেই আর!
অনন্যা বাথরুম থেকে বেরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার শরীরে একটা সুতোও নেই।
"এসো, আরেকবার স্নান করবে?"
"শুয়োরের বাচ্চা। খানকি মাগী। লজ্জা লাগে না অচেনা লোকের সঙ্গে এত দূর চলে এলি?"
চিৎকার করে উঠল রজত।
অনন্যা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসব কী কথা?"
রজত ছুটে গিয়ে অনন্যার গলা টিপে ধরল, "এই মাগী, জানোয়ার, কেন এসেছিস তুই আমার সঙ্গে? কী মধু আছে? তুই কল গার্ল, তুই খানকি, ক'টা ভাতার আছে তোর? ক জনের সঙ্গে শুয়েছিস, সত্যি করে বল"।

অনন্যা আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে। সে রজতকে ঠেলতে চেষ্টা করল, পারল না। রজত অনন্যার মাথাটা দেওয়ালে তীব্র জোরে ঠুকে দিল।
ধাক্কা খেয়ে অনন্যা মেঝেতেই পড়ে গেল।
রজত অনন্যার মাথাটা ক্রমাগত মেঝেতে ঠুকতে শুরু করল। মেঝেতে রক্ত গড়াতে শুরু করে দিয়েছে।
রজত চিৎকার শুরু করল, "নেমকহারাম, শুয়োরের বাচ্চা, জানোয়ার..."
তার মাথা কাজ করছে না।
বিয়াল্লিশ লাখ টাকা! এত টাকা মেরে দিয়েছে তার? কী করবে সে? অতোগুলো গয়নার টাকা! সব মেরে দিয়েছে!
ঘরের মধ্যে অনন্যা পড়ে রইল। সে রক্তাক্ত হাতে ঘর থেকে বেরোল। ঘরের বাইরে হোটেলের বয় বিস্ফারিত চোখে দেখল রজত রক্তাক্ত হাতে চিৎকার করছে, "আমার টাকা মেরে দিয়েছে, কোথায় রেখেছে, জানোয়ার! শুয়োরের বাচ্চা! শুয়োর...তোকে পাই একবার..."
হোটেলের লবিতে রজতকে আটক করতে চোদ্দ জন লাগল। তার গায়ে আসুরিক শক্তি। রজত চিৎকার করে চলেছে পাগলের মত। পিঠে অসহ্য ব্যথা করছে তার। মাথায় শক্তিশালী কিছুর বাড়ি পড়ল যেন।
জ্ঞান হারাবার আগে ছোটকাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রজত। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে হো হো করে...

৩১

।। "বেওয়াফা সনম" ।।

"আরে কী সৌভাগ্য! কত দিন পরে দেখা হল!"

অরুণাক্ষ কৌশিককে দেখা মাত্র এগিয়ে এলেন।

কৌশিকের ক্লান্ত লাগছিল। সে বলল, "আমায় গরম চা খাওয়াবে? একদম আগুন গরম। সেই সকালে চলে এসেছি। সারারাত ধরে ওই পোড়া গন্ধটা নাকে ঢুকে আছে। আর পারছি না"।

অরুণাক্ষ কৌশিককে বসিয়ে সামন্তকে দিয়ে চা আনতে পাঠালেন।

বললেন, "এখানে চলে এলে যে? কী মনে করে?"

কৌশিক সিগারেট ধরিয়ে বলল, "কিছু মনে করে না। ছবিটা দেখে মনে হল দেখে আসি, ঠিক কী কেস। এর হাজব্যান্ডকে দেখে তো সেরকম কিছুই মনে হল না"।

অরুণাক্ষ বললেন, "কাউন্টার দিও সিগারেটটা। নাহ। কিছু মনে হবেও না। এ ওর হাজব্যান্ডের কাজ না। ব্যাঙ্কে কাজ করতেন তো ভদ্রমহিলা। হানিট্র্যাপড টাইপ হয়েছিলেন আর কী। ঠিক কোন পাবলিক এটার পিছনে জড়িত, সেটা জানতে আমাদের মনে হয় না বেশি পরিশ্রম করতে হবে। অনেক সূত্রই এদিক সেদিক পড়ে আছে। যত্ন করে তুলে নিলেই হল"।

কৌশিক বলল, "হাজব্যান্ডটাকে ক্লিন শিট দিচ্ছো কেন? লোকটাকেও তো আমার কেমন গন্ধ গন্ধ মনে হল"।

অরুণাক্ষ হেসে ফেললেন, "গন্ধ গন্ধ? তা বলতে পারো। তবে কিছু পাবলিক হয় না, ম্যাদাম্যারা পারসোনালিটি লেস টাইপ? এই লোকটা সেরকম। এরা ফ্যান্টাসাইজ করতে পারে বউকে মারার, পারে না। আর ভদ্রমহিলা তো ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন"।

কৌশিক দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল। বলল, "গোটা রাতটা যা গেছে, তা আর কী করে বলব! আর একদিকে সাউ সাহেব সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। কী যে বিরক্তিকর লোক। খালি জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে"।

অরুণাক্ষ বললেন, "আমিও এখনো ঘুমোতে যেতে পারি নি। রাতে সোনাগাছি রেইডে গেলাম। তারপর এই কেস। মোবাইল বরকে ধরতে দেয় না। এদিকে বর বউয়ের ফোনের পাস কোড জানে। তলে তলে ঠিকই গোয়েন্দাগিরি চলত বউয়ের উপর। এদিকে পারসোনালিটি নেই বলে চার্জও করত না"।

কৌশিক অরুণাক্ষর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না? আমারও তাই মনে হয়েছে। আরেকটা জিনিস মনে হল..."

অরুণাক্ষ বললেন, "কী বল তো?"

কৌশিক বলল, "মনে হচ্ছে উনি কিছু একটা..." তার ফোন বেজে উঠল। এস পি। কৌশিক বলল, "এই দেখো, নাম নিতে না নিতেই ফোন করল। অনেকদিন বাঁচবে। ধরি দাঁড়াও। হ্যাঁ স্যার"।

"কৌশিক। থানায় ফোন করেছিলাম। তুমি কোলকাতা চলে এসেছো?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি ওই ঠিকানায়..."

সাউ হেসে উঠলেন, "আমার মনে হয়েছিল তুমি তাই করবে। যাই হোক, কৌতূহল নিরসন করলে?"

"হ্যাঁ স্যার। এই এখন অরুণাক্ষর কাছে এসেছি। এখান থেকে বেরিয়ে যাব"।

"যাক, ঘটনাটা কিছুটা হলেও তোমাকে কিক দিয়েছো বলছ?"

“কিকের কিছু না স্যার। সারারাত পোড়া গন্ধ শুঁকলাম তো, মাথা ঠিক নেই। ঘোরের মাথাতেই চলে এলাম আর কী”।
“বরটাকে দেখলে?”
“হ্যাঁ। দেখলাম। কিছু বলার নেই আর কী”।
“হু। আমি সি আই ডিকে কেসটা দিয়েছি। ওর বরের কি কিছু ডিমান্ড আছে?”
“সেরকম তো কিছু নেই। চাকরি বাকরি নেই। মেয়েটা ব্যাঙ্কে কাজ করত। এবার কোন ডেথ বেনিফিট বা ইনসিউরেন্স আছে নাকি সেগুলো দেখতে হবে। সেখান থেকে টাকা পাবে খানিকটা”।
“ঠিক আছে। অরুণাক্ষ সেটা দেখুক। ব্যাঙ্কের সঙ্গেও কথা বলতে হলে সি আই ডি বলবে। তুমি কখন ফিরবে?”
“এই তো স্যার। বেরোব একটু পরে”।
“ঠিক আছে। ফিরে জানিও। বাই”।
ফোন কেটে গেল।
অরুণাক্ষ হেসে উঠল, “এ ভাই, এ তো বউয়ের মত ফোন করে”।
কৌশিক রাগী মুখে বলল, “আর বলছি কী”।
চা এল। কৌশিক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, “আহ। বাঁচলাম। আমার একটা কাজ করে দেবে?”
অরুণাক্ষ বললেন, “বল। কেন করব না?”
কৌশিক বলল, “আমার একটা ওয়াইল্ড গেস তৈরি হয়েছে মাথায়। সন্দেহের নিরসন করতে চাই। যাবে আরেকবার ওই বাড়িটায়?”
অনিমেষ হাসলেন, “ঠিক আছে যাব। সন্দেহ যখন হয়েছে, মেটাতে তো হবেই, তাই না?”
কৌশিক ছোট ছোট সিপে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, “একজ্যাক্টলি”।
#
দরজাটা খুলে তাদের দেখে অনিমেষ বলল, “ওহ আপনারা?”
অরুণাক্ষ বললেন, “বেরচ্ছিলেন?
অনিমেষ বলল, “হ্যাঁ, ওই পিন্টোর খাবার শেষ হয়ে গেছিল। আনতে যাচ্ছিলাম”।
অরুণাক্ষ বললেন, “কী খাবার? ওহ আপনি নামটা বলেছিলেন বটে। পেডিগ্রি না কী যেন?”
অনিমেষ বলল, “হ্যাঁ। ভেতরে আসবেন?”
অরুণাক্ষ বললেন, “হ্যাঁ। কৌশিকের কী কথা আছে। এসো কৌশিক”।
তারা আবার সোফায় বসল।
অনিমেষ ঠিক সামনের সোফাতেই বসল। কৌশিক বলল, “অনিমেষবাবু, আপনার পায়ের তলায় একটা ব্যাগ আছে। দেখাবেন ব্যাগে কী আছে?”
অনিমেষ চমকে উঠল। বলল, “না... না। ব্যাগ নেই। ব্যাগ কোথায়?”
কৌশিক একবার অরুণাক্ষর দিকে তাকিয়ে হেসে অনিমেষকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার পায়ের তলা থেকে ব্যাগটা বের করে মেঝেতে রেখে ব্যাগের চেন খুলে দিল। অরুণাক্ষ বিস্মিত হয়ে দেখলেন ব্যাগ ভর্তি টাকার বান্ডিল।
অনিমেষ চিৎকার করে উঠল, “এত সাহস আপনাদের? কার অনুমতি নিয়ে আমার ব্যাগটা খুললেন? ওয়ারেন্ট এনেছেন কোন? কেন খুললেন?”
অরুণাক্ষ বললেন, “একী! আপনার মত ম্যাদামারা লোকের এত ব্যক্তিত্ব এল কোত্থেকে?”
কৌশিক বলল, “কার টাকা এটা অনিমেষ বাবু?”
অনিমেষ বলল, “আমার। আবার কার টাকা হবে?”

কৌশিক পকেট থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে অনিমেষের কপালে ধরে বলল, “এখানেই গুলি করে উড়িয়ে দেব। বল শিগগির”।
পিন্টো তুমুল চিৎকার করতে শুরু করল।
জোঁকের মুখে নুন পড়ল। অনিমেষ মাটিতে বসে পড়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “ও টাকা আমার। ও টাকা না থাকলে আমি না খেয়ে মরব কৌশিকবাবু। বিশ্বাস করুন, আমি ওকে খুন করি নি। আমি জানতামই না ও খুন হয়েছে। কাল বাড়ি না ফেরায় আমি ওর ঘর চেক করতে গিয়ে টাকাগুলো পেয়েছি। কিন্তু... কিন্তু এ টাকা না থাকলে আমি না খেয়ে মরব। কে খাওয়াবে আমাকে? আমি রোজগার করি না। ওই তো খাওয়াত। আমি না খেতে পেয়ে মরব। বিশ্বাস করুন”।
কৌশিক হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইল। অরুণাক্ষর কিছুতেই বিস্ময় যাচ্ছিল না।
অনিমেষ জোরে জোরে শ্বাস টানছে। বলল, “আপনাদের আমি কী বলব? কী বলার আছে? কাল ও ফিরছিল না। আমি ওর ঘরে গিয়ে সব খুঁজতে শুরু করে এই টাকাটা পেলাম। এটাই আমার ভরসা। আমি এর ভরসাতেই আছি। নইলে ভিক্ষে করা ছাড়া কোন গতি থাকবে না। ও কোত্থেকে এত টাকা পেয়েছে আমি জানি না। আমি শুধু জানি এতে আমার বাকি জীবনটা নিয়ে কোন চিন্তা থাকবে না। আপনারা বুঝছেন না বলুন? আপনারা তো চাকরি করেন। আপনারা কী করে বুঝবেন? সব কিছুতে কারো কাছে হাত পাতার যন্ত্রণা বোঝার ক্ষমতা কত জনের হয়? আমি পালিয়ে যাব কোথাও! আমি কী করব? আমার কীই বা করার আছে?”
কৌশিকের হতবুদ্ধি লাগছিল। অনিমেষের অবস্থাটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। অবিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছুটা হলেও সে লোক চেনে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে এই তথ্যটা লুকোয় কী করে?
অরুণাক্ষ বললেন, “ব্যাগটা আপনার কাছে থাকা মানে আপনি সন্দেহের র‍্যাডারে চলে আসবেন। ধরে নেওয়া হবে এই টাকার জন্যই আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন”।
অনিমেষ বলল, “আমার স্ত্রীকে খুন করতে হলে লোক দিয়ে করব কেন? আমি নিজেই করব! বেশ্যা মেয়েছেলে একটা। ওর থেকে সোনাগাছির মেয়েরা ভাল”।
কৌশিক চুপ করে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন কোন সম্পর্ক ড্রেনের মত হয়। সুদৃশ্য শহরের মত সম্পর্কের নিচে থাকে সে ড্রেন। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে গেলে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। এই লোকটার অবস্থাও সেরকম। দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে।
একের পর এক।
সে অরুণাক্ষর দিকে তাকিয়ে বলল, “কী করবে?”
অরুণাক্ষ বললেন, “দেখুন অনিমেষবাবু, তদন্ত, তদন্তের মত চলবে। কিন্তু এই টাকা যদি আপনার কাছে রেখে আপনি খরচ করতে শুরু করেন, আপনি ফেঁসে যাবেন। আপনার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমি এই কথাটা বলছি”।
অনিমেষ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “ও, আপনারা হিস্যা চান, তাই তো? কত দিতে হবে?”
কৌশিক হেসে ফেলল, “না। হিস্যা চাই না। শুধু আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, আপনাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিলেও কি আপনি পরে বেঁচে যাবেন?”
অনিমেষ কেঁদে ফেলল, “তাহলে কী করব আমি?”
অরুণাক্ষ কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “টাকাটা যেহেতু এখানেই পেয়েছেন উনি, আপাতত ওর কাছে থাক। যদি ব্যাঙ্ক টাকাটা ক্লেইম না করে, তাহলে নিয়মমত টাকাটা ওর হয়ে যাবে। ব্যাপারটা সিম্পল”।
কৌশিক বলল, “যদি না খুনটা উনি করিয়ে থাকেন”!
অনিমেষ বলল, “আমাকে দেখে মনে হয় আমি খুন করতে পারি?”
কৌশিক হেসে ফেলল, “টাকাটা দিয়ে আপনি কী করবেন?”

অনিমেষ বলল, “নিজের মত বাঁচব। বেঁচে থাকাটাও তো জরুরি। তাই না?”
কৌশিক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল, “তা ঠিক। তা ঠিক। বেঁচে থাকাটাও জরুরি। যান, আপনার কুকুরকে শান্ত করুন। ব্যাটা ভাবছে আপনাকে মেরেই ফেললাম হয়ত”।
অনিমেষ উঠল না। পিন্টো চিৎকার করেই যেতে লাগল। একটা প্রবল অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে তারা বসে রইল।
#
হাজতে রজত বসে আছে। পারফিউমের গন্ধে চারদিক ম ম করছে। একটা ছ্যাঁচড় এসে তাকে ঠেলে জিজ্ঞেস করল, “কিরে, কী করেছিস তুই?”
রজত উত্তর দিল না।
ছোটকা তার সামনে বসে হেসেই চলেছে। জোরে জোরে হাসছে। একটু দূরে ছোটকাকী। তার পাশে পর্ণা। পূরবী। রূপসা। তারা সবাই নগ্ন।
গলার কাছটা কাটা। পাশের লোকটা তাকে ঠেলল, “ক্যা রে, গুঙ্গা হ্যায় ক্যা?”
রজত সামান্য ঠেলাতেই পড়ে গেল। কনস্টেবল সেটা দেখে চিৎকার করে উঠল।
রজতের কোন কিছুই কানে গেল না।
সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কোন কিছু মাথায় আসছে না। ওরা সবাই হাসতে শুরু করেছে তাকে দেখে।
রজত বিড় বিড় করে বলল, “টাকাটা কোথায় রেখেছিস পর্ণা? ঠকিয়ে গেলি মাগী? কাকে দিয়েছিস?”
দেওয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করল সে।
কনস্টেবল দৌড়ে গিয়ে ওসিকে বলল, “স্যার, মেন্টাল কেস স্যার। এখানে রাখা যাবে না”।
ওসি কিছুক্ষণ লক আপের বাইরে রজতের চিৎকার চ্যাঁচামেচি দেখে মাথা নাড়লেন।
কনস্টেবল ঠিকই বলেছে। একে মেন্টাল অ্যাসাইলামেই পাঠাতে হবে।

৩২

।।"জানে ও ক্যায়সে লোগ থে জিনকে"।।

।।দু দিন পরের কথা।।

"একটা ভাল হোটেলেও রাখতে পারলে না। এই জন্য আগে থেকে বুক করে আসতে হয়। অকম্মার ঢেঁকি একটা"।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে রণিতা গজগজ করছিল।

বিমর্ষ মুখে বসে শীলভদ্র ফোন দেখতে দেখতে পাউরুটি চিবোচ্ছিল।

ফেসবুক ঘাটছিল সে। রণিতা নিজের ফোন ঘাঁটছিল। বলল, "বিকেলে কেনাকাটি করতে বেরোব। এরপর তো পেলিং নিয়ে যাবে। ওখানে শুনেছি কিছুই পাওয়া যায় না। আমার অনেক কিছু কেনার আছে"।

মুখে "হু" বলে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে শীলভদ্রর আচমকা চোখ পড়ল একটা খবরের হেডলাইনে, "মৃতপ্রায় অবস্থায় বাঙালি কন্যা উদ্ধার মুম্বই থেকে"।

খবরে সেই এয়ারপোর্টের লোকটার একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি দেওয়া। শীলভদ্র জোরে বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করল। রণিতা বলল, "কী মরণ মরলে আবার?"

শীলভদ্র বলল, "কিছু না। বাথরুম থেকে আসছি"।

বাথরুমে ঢুকে খবরের লিঙ্কটা খুলল সে। লিঙ্কে লেখা

"কথাতেই আছে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। আর এ ঘটনা যেন হলিউডের সিনেমাকেও হার মানায়। জ্যাক দ্য রিপার, জেফ্রি ডেমার কিংবা হ্যারোল্ড শিপম্যান? এরা তো বিদেশের চরিত্র। আর এবার আমাদের দেশে ধরা পড়ল এমনই একজন সাংঘাতিক খুনি। এ যেন দুয়ারে সাইকো!

এমন একজন মানসিক রুগী, যার কাজ হল একা মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে খুন করা। তিনি বাঙালি। পোশাক ও ভাষায় অভিজাত, কথায় মধু ঝরে পড়ছে, অথচ পর্দার আড়ালে তিনি আদতে একজন সাইকো কিলার। রজত সান্যাল ওরফে ববি, ওরফে মুকেশ ঠাকুর ওরফে... আর কত নামই বা বলব? অসংখ্য আইডেন্টিটি তৈরি করে মেয়েদের তার ফাঁদে ফেলে খুন করাটাই জীবনের লক্ষ্য। মাত্র একদিন আগেই রজত কলকাতার ব্যাঙ্ক কর্মী পর্ণা হালদারকে তার জালে ফেলে খুন করে হাইওয়ের পাশে পুড়িয়ে দিয়ে মুম্বই পাড়ি দিচ্ছিল। পথে পরিচয় হল অনন্যার সঙ্গে। কথা এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ অনন্যা তার গন্তব্যই পাল্টে ফেলল! আগু পিছু না ভেবে রজতের সঙ্গে মুম্বই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ঠিক কোন জায়গা থেকে তার নার্ভাস ব্রেকডাউন শুরু হয়েছিল, এখন সে ঘটনারই তদন্ত শুরু হবে। অপরাধী কিছুই বলার মত জায়গায় আর নেই, কারন এই মুহূর্তে সে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তাকে মুম্বই থেকে কলকাতা নিয়ে আসার জন্য বিশেষ দল মুম্বই পাড়ি দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানী মঞ্জীরা ঘোষ দস্তিদার জানাচ্ছেন 'এরকম অপরধীদের ক্ষেত্রে এমন পরিণাম হওয়াটা মোটেই অদ্ভুত কিছু ব্যাপার না। এরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে দিতে এমন একটা জায়গায় চলে যায়, এরা ভেবেই নেয় এদের কিছুতেই ধরা যাবে না। এরা নিজেদের অপরাজেয় মনে করে। রজতের নার্ভাস ব্রেকডাউনটা না হলে সে হয়ত এত তাড়াতাড়ি ধরাও পড়ত না'। মুম্বই থেকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার হওয়া বাঙালি কন্যা অনন্যা আপাতত মুম্বইতে চিকিৎসাধীন আছেন। তার পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে দেখা করতে মুম্বই যাচ্ছেন। বিস্তারিত আরো খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের পেজে"...

খবরটা বেশ কয়েকবার পড়ল শীলভদ্র।
ওই লোকটা... অনন্যার সঙ্গে ছিল এয়ারপোর্টে! লোকটা সাইকো?
সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থেকে হো হো করে হাসতে শুরু করল। রণিতা দরজা ধাক্কাতে শুরু করল, "কী হল? এতক্ষণ ধরে কী করছ বাথরুমে?"
শীলভদ্র নিজেকে সামলাল।
চোখে মুখে জল দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "পেটটা একটু খারাপ হয়েছে"।
রণিতা বলল, "তা তো হবেই। বেড়াতে এসেছো। বেড়ানোর বারোটা না বাজালে হয়? বল এবার, সব ক্যান্সেল, তাই তো?"
শীলভদ্র বলল, "না না ক্যান্সেল কেন হবে? চল চল। বেরোব"।
রণিতা সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে বলবে?"
শীলভদ্র সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "কী আর হবে? কিছুই হয় নি। তুমি তৈরি?"
রণিতা বলল, "হ্যাঁ। আশা করব পেলিং এর হোটেলটা ভাল হবে? নাকি সেটাও এরকমই জঘন্য?"
শীলভদ্র চিন্তিত মুখে রণিতার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল, পাহাড়, নির্জন কোণ, খাদ... ঠেলে ফেলে দিলে কি খুব চাপ হবে?
ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল সে।
রণিতা রেগে বলল, "কী হল? কীসের এত আনন্দ তোমার?"
শীলভদ্র বলল, "না না কিছু না। চল বেরোই। আবার ছাঙ্গু যেতে হবে তো"।
রণিতা হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।
শীলভদ্র ধীর পায়ে হেঁটে গাড়ির দিকে রওনা দিল।
কত অংক করতে হয়...
সামান্য কিছু হিসেব নিকেশ।
তবু কত কঠিন অঙ্ক সে সব...